http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

মায়েরা সায়েন্টিস্ট

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

Edited & Scanned By

Shaibal & Jiku
shaibalrony@yahoo.com
01711982559

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

Edited & Scanned BY:
Shaibal & Jiku
shaibalrony@yahoo.com
01711982559

সূচি

জরিনি ইঁদুর / ৯
মোল্লা গজনফর আলী / ৫৫
মালিশ মেশিন / ১০৩

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

For More Books Please contact:
shaibalrony@yahoo.com
01711982559

জরিনি ইঁদুর

মগবাজারের মোড়ে স্কুটার থেকে নেমে আমি পকেট থেকে তিনটা দশ টাকার নোট বের করে স্কুটার ড্রাইভারের হাতে দিলাম। ড্রাইভার নোট তিনটার দিকে এক নজর দেখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "পঁয়ত্রিশ টাকা?"

স্কুটার ড্রাইভার তার পান খাওয়া দাঁত বের করে একগাল হেসে বলল, "জে। পঁয়ত্রিশ টাকা।"

"আপনি না ত্রিশ টাকায় রাজি হলেন?"

ড্রাইভার তার মুখের হাসি আরও বিস্তৃত করে বলল, "জে না। রাজি হই নাই।"

"সে কী!" আমি রেগে উঠে বললাম, "আপনি পঁয়ত্রিশ টাকা চেয়েছিলেন। আমি বললাম, ত্রিশ টাকায় যাবেন? আমার স্পষ্ট মনে আছে আপনি মাথা নাড়লেন।"

স্কুটার ড্রাইভার ভুরু কুঁচকে বলল, "মাথা নেড়েছিলাম?"

"হ্যাঁ।"

স্কুটার ড্রাইভার মুখ গম্ভীর করে তার মাথাটা নেড়ে দেখিয়ে বলল, "এইভাবে?"

"হ্যাঁ। এইভাবে।"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

ড্রাইভারের মুখের গাম্ভীর্য সরে সেখানে আবার মধুর হাসি ফুটে উঠল। সে তার সবগুলো দাঁত বের করে হেসে বলল, "সেটা অন্য ব্যাপার।"

"অন্য কী ব্যাপার?"

"[illegible] বেকায়দা ঘুম গেছিলাম তাই ঘাড়ে ব্যথা।"

ত্রিশ টাকা ভাড়ার সাথে ঘাড়ে ব্যথার কী সম্পর্ক বুঝতে না পেরে আমি অবাক হয়ে বললাম, "ঘাড়ে ব্যথা?"

"জে। রগে টান পড়েছে। সকাল বেলা গরম সরিষার তেলে রসুন দিয়ে মালিশ করেছি। একটু পরে পরে মাথা নাড়ি তখন ঘাড়ের এক্সারসাইজ হয়।"

"তার মানে– তার মানে–" আমি রেগে গিয়ে কথা শেষ করতে পারি না, কিন্তু স্কুটারওয়ালা একেবারেই বিচলিত হয় না। মুখে আরও মধুর হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমি মাথা নাড়লাম ঘাড় ব্যথার কারণে আর আপনি ভাবলেন ত্রিশ টাকায় রাজি হয়েছি! হা-হা-হা–"

আমি হতবুদ্ধি হয়ে স্কুটারওয়ালার দিকে তাকিয়ে রইলাম– ত্রিশ টাকার জায়গায় পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া দিতে আমার যে একেবারে জীবন চলে যাবে তা নয়, কিন্তু কেউ যে এরকম একটা অদ্ভুত কান্ড করতে পারে আমার বিশ্বাস হয় না। স্কুটারওয়ালা তার কেনে আঙুলটা কানে ঢুকিয়ে নির্মমভাবে কান চুলকাতে চুলকাতে বলল, "আজকাল কী ত্রিশ টাকা স্কুটার ভাড়া আছে? নাই। চাক্কা ঘুরলেই চল্লিশ টাকা। আপনাকে দেখে মনে হলো সোজা সিধে মানুষ, তাই মায়া করে বললাম পঁয়ত্রিশ টাকা–"

"মায়া করে বলেছেন পঁয়ত্রিশ টাকা?" আমার না কী ব্লাড প্রেসার বেশি, ডাক্তার বলেছে রাস্তাঘাটে রাগারাগি না করতে– তাই অনেক কষ্ট করে মেজাজ ঠান্ডা রেখে বললাম, "মায়া করে আর কী কী করেন আপনি?"

আমার কথা শুনে মনে হলো স্কুটার ড্রাইভারের মুখে একটা গভীর বেদনার ছাপ পড়ল। সে মাথা নেড়ে বলল, "আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না স্যার? আপনার মুখে একটা মাসুম মাসুম ভাব আছে– দেখলেই মায়া হয়। আমার কথা বিশ্বাস না করলে এই আপাকে জিজ্ঞেস করেন।"

স্কুটার ড্রাইভার কোন আপার কথা বলছে দেখার জন্য মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম, আমাদের দুইজনের খুব কাছেই শাড়ি পরা একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে কিছুটা মোবাইল ফোন কিছুটা ক্যালকুলেটরের মতো একটা যন্ত্র। সেই মেয়েটি কিংবা মহিলাটি মনে হলো খুব মনোযোগ

দিয়ে আমার সাথে স্কুটার ড্রাইভারের কথাবার্তা শুনছে। ড্রাইভার তাকে সালিশ মানার পর সে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছে।"

"কী ঠিক বলেছে?" ডাক্তারের কড়া নির্দেশ তাই আমি কিছুতেই গলার [illegible] আমার চেহারাটা মাসুম মাসুম সেইটা, না কী আমার ওপরে মায়া করে সে স্কুটার ভাড়া বেশি নিচ্ছে সেইটা।"

মেয়েটা আমার কথায় উত্তর না দিয়ে বলল, "ইন্টারেস্টিং!"

"কী ইন্টারেস্টিং?"

"আপনি ভাব করছেন যে আপনি রাগেননি– কিন্তু আসলে আপনি খুব রেগে গেছেন। পাঁচ টাকার জন্য মানুষ এতো রাগ করতে পারে আমি জানতাম না।"

আমি গলার স্বর একেবারে বরফের মতো ঠান্ডা করে বললাম, "আপনি কেমন করে জানেন যে আমি রাগ করছি?"

মেয়েটা কিছুটা মোবাইল ফোন কিছুটা ক্যালকুলেটরের মতো দেখতে যন্ত্রটা আমাকে দেখিয়ে বলল, "আমার ভয়েস সিন্থেসাইজার বলে দিচ্ছে। আজকেই প্রথম ফিল্ড টেস্ট করতে বের করেছি। এক্সেলেন্ট কাজ করছে। এই দেখেন।"

মেয়েটা কী বলছে বুঝতে না পেরে আমি হা করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মেয়েটা উৎসাহ নিয়ে বলল, "প্রত্যেকটা মানুষের ভোকাল কর্ডের কিছু ন্যাচরাল ফ্রিকোয়েন্সি থাকে। মানুষ যখন রেগে যায় তখন কয়েকটা ওভারটোন আসে। এই দেখেন আপনার মেগা ওভারটোন– যার অর্থ আপনি রেগে ফায়ার হয়ে আছেন।"

একজন মানুষ– বিশেষ করে একজন অপরিচিত মেয়ে মানুষ যদি একটা যন্ত্র দিয়ে বের করে ফেলে আমি রেগে ফায়ার হয়ে আছি তখন রেগে থাকা ঠিক না– তাই আমি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম মেজাজটাকে নরম করার জন্য। স্কুটার ড্রাইভার এই সময় আবার তাগাদা দিল, "স্যার, ভাড়াটা দিয়ে দেন আমি যাই।"

মানুষের মেজাজ কতটুকু গরম হয়েছে বের করে ফেলার আজব যন্ত্রটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি হাসি হাসি মুখে বলল, "দিয়ে দেন। ড্রাইভার সত্যি কথাই বলছে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কেমন করে জানেন?"

মেয়েটা হাতে ধরে রাখা যন্ত্রটা উঁচু করে বলল, "আমার ভয়েস সিন্থেসাইজারের ফিল্ড টেস্ট হচ্ছে। মিথ্যা কথা বললে হায়ার হারমনিক্স আসে। এই দেখেন ড্রাইভারের গলার স্বরে কোনো হায়ার হারমনিক্স নাই।"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

হায়ার হারমনিক্স কী, সেটা না থাকলে কেন মিথ্যা কথা বলা হয় না এই সব নিয়ে অনেক প্রশ্ন করা যেতো কিন্তু আমার আর তার সাহস হলো না। মানিব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ড্রাইভারের দিকে এগিয়ে দিলাম। স্কুটারের ড্রাইভার উদাস উদাস ভাব করে বলল, "ভাংতি নাই স্যার– ভাংতি দেন।"

আমি কী বলতে কী বলে ফেলব আর এই আজব যন্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটা সেখান থেকে কী বের করে ফেলবে সেই ভয়ে আমি হাত নেড়ে বললাম, "ঠিক আছে পুরোটাই রেখে দেন।"

ড্রাইভার অবাক হয়ে বলল, "পুরোটাই রেখে দেব?"

"হ্যাঁ।"

স্কুটার ড্রাইভার মুখে খুব অনিচ্ছার একটা ভঙ্গি করে টাকাটা পকেটে রেখে বলল, "আপনি যখন বলছেনই তখন আর কী করা স্যার, রাখতেই হবে। আমি কিন্তু এমনিতে কখনোই এক পয়সা বেশি রাখি না। যত ভাড়া তার থেকে এক পয়সা বেশি নেওয়া হচ্ছে হারাম খাওয়া। হারাম খাওয়া ঠিক না– হারাম খাওয়ার পর সেই হারাম রুজি দিয়ে শরীরের যে অংশে রক্ত মাংস তৈরি হয় সেই অংশ দোজখের আগুনে পুড়ে। শিক কাবাবের মতো।"

স্কুটার ড্রাইভার দোজখের আগুনের বর্ণনা দিতে দিতে তার স্কুটার স্টার্ট দিয়ে রাস্তায় নেমে গেলো। ক্যালকুলেটর এবং মোবাইল ফোনের মতো দেখতে যন্ত্রটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি তার যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চিৎকার করে বলল, "এই যে হায়ার হারমনিক্স আসছে! তার মানে এই ব্যাটা মিথ্যা কথা বলেছে! স্কুটারওয়ালা– এই স্কুটারওয়ালা–"

কিন্তু ততক্ষণে স্কুটার ড্রাইভার তার স্কুটার নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। মেয়েটা রাগ রাগ মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখেছেন ব্যাটা ধড়িবাজের কাজটা? ডাটা প্রসেস করতে একটু সময় নেয় তার মাঝে হাওয়া হয়ে গেলো। ব্যাটা ফাজিল–"

আমি হাত নেড়ে বললাম, "যাক। পাঁচ টাকাই তো–"

মেয়েটা হাত ঝাঁকিয়ে বলল, "মিথ্যা কথা বলে পাঁচ টাকা কেন পাঁচ [illegible]"

আমি একটু ভয়ে ভয়ে মেয়েটার দিকে তাকালাম, রাগী মহিলাদের আমি খুব ভয় পাই। বিশেষ করে রাগী নারীবাদী মহিলারা খুব ডেঞ্জারাস হয়। ছাত্র জীবনে আমাদের সাথে ডালিয়া নামে একটা মেয়ে পড়তো, তাকে একবার ঢ্যালঢ্যালা ডালিয়া ডেকেছিলাম, সেটা শুনে তার নারীবাদী বান্ধবী আমাকে দেওয়ালে চেপে ধরে পেটে ঘুষি মেরেছিল। ঘুষি খেয়ে বেশি ব্যথা পাইনি কিন্তু পুরো প্রেস্টিজ ধসে গিয়েছিল। মেয়েদের হাতে মার খায় মানুষটা দেখতে কেমন তা দেখার জন্য আর্টস ফ্যাকাল্টি থেকে ছাত্রছাত্রীরা চলে আসতো।

মেয়েটা তার যন্ত্রটির দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল– আমি চলে যাব না থাকব বুঝতে পারলাম না। কিছু একটা বলার দরকার কিন্তু কী বলব সেটাও বুঝতে পারলাম না। মানুষের সাথে মোটামুটি আমি কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারি কিন্তু মেয়েদের বেলায় খুব সমস্যা হয়। অপরিচিত মানুষের সাথে কথা বলার জন্য তার বয়সটা জানলে খুব সুবিধে হয় কিন্তু মেয়েদের বয়স আন্দাজ করা খুব কঠিন। একবার একটা পার্টিতে একটা মেয়ের থুতনি ধরে আদর করে বলেছিলাম, "খুকি তুমি কোন ক্লাসে পড়?" মেয়েটা ঝটকা মেরে আমার হাত সরিয়ে বলেছিল, "ফাজলেমি করেন? আমি ইউনিভার্সিটির টিচার?" শুনে আমার একেবারে হার্টফেল করার অবস্থা। একেবারে দুধের শিশুদের ইউনিভার্সিটির টিচার বানালে সেই ইউনিভার্সিটিতে কী পড়াশোনা হতে পারে? আরেকবার এক বাসায় গিয়ে মোটাসোটা এক ভদ্রমহিলাকে বললাম, "আন্টি, আংকেল কী বাসায় আছেন?" সেই ভদ্রমহিলা ভ্যা করে কেঁদে দিল, বলল, "এ্যাঁ এ্যাঁ– আমি মাত্র ক্লাস সেভেনে পড়ি– আমাকে এই মানুষটা আন্টি ডাকে! এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ–" সেই থেকে আমি কখনোই কোনো মেয়ের বয়স আন্দাজ করে বের করার চেষ্টা করি না। এখানেও এই মহিলার কিংবা মেয়ের বয়স কতো অনুমান করার কোনো চেষ্টা না করে, শুধুমাত্র আলাপ চালানোর জন্য বললাম, "খুব মজার যন্ত্র। তাই না?"

মেয়েটা ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হুঁ।"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

আমি গলার স্বরে একটা দার্শনিকতার ভাব এনে বললাম, "বিজ্ঞানের কতো উন্নতি হয়েছে– একটা যন্ত্র দিয়ে মনের অনুভূতি বের করে ফেলা যায়। কী আশ্চর্য!"

মেয়েটা আবার বলল, "হুঁ।"

"বিদেশ থেকে এনেছেন বুঝি যন্ত্রটা? কতো খরচ পড়েছে?"

মেয়েটা আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল, তারপর বুকে থাবা দিয়ে বলল, "এইটা আমি তৈরি করেছি।"

আমি চমকে উঠলাম, বলে কী মেয়েটা! আবার ভালো করে তাকালাম মেয়েটার দিকে, আমার সাথে ঠাট্টা করছে না কী? মেয়েটার চোখে মুখে অবশ্যি ঠাট্টার কোনো চিহ্ন নেই– বলা যেতে পারে এক ধরনের রাগের চিহ্ন আছে। আমাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল, "কী হলো? আমার কথা বিশ্বাস হলো না?"

আমি তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বললাম, "না-না– বিশ্বাস হবে না কেন? অবশ্যই বিশ্বাস হয়েছে।"

"তাহলে এরকম চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছেন কেন?"

"চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছি না কী?" আমি চোখগুলো ছোট করার চেষ্টা করে এমন একটা ভান করার চেষ্টা করতে লাগলাম যেন রাস্তাঘাটে এরকম খ্যাপা টাইপের একটা মেয়ে যে না কী ভয়ঙ্কর যন্ত্রপাতি তৈরি করে তার সাথে দেখা হওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

মেয়েটা বলল, "হ্যাঁ, আপনি চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছেন। আপনি মনে মনে কী ভাবছেন সেটাও আমি জানি।"

"কী ভাবছি?"

"আপনি ভাবছেন এই মেয়েটা নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলছে। মেয়েরা কী আবার কখনো সায়েন্টিস্ট হতে পারে? সায়েন্টিস্ট হবে ছেলেরা। তাদের মাথায় হবে উস্কোখুস্কো চুল, তাদের থাকবে কাঁচা-পাকা বড় বড় গোঁফ। তারা হবে আপনাভোলা। তাদের চোখে থাকবে বড় বড় চশমা তারা ঠিক মতো নাওয়া খাওয়া করবে না, ভুশভুশে কাপড় পরে উদাস উদাস চোখে তারা ঘুরে বেড়াবে। ঠিক বলেছি কী না?"

আমি বললাম, "না, মানে ইয়ে– বলছিলাম কী– মানে ইয়ে–"

ঠিক তখন পাশে একটা শোরগোল শুরু হলো, দেখলাম একজন লিকলিকে শুকনো মানুষ একজন ইয়া মুশকো জোয়ান মানুষের কলার ধরে

রিকশা থেকে টেনে নামিয়ে আনছে, দুইজনই চিৎকার করে হাত-পা নাড়ছে যেন পারলে একজন আরেকজনকে খুন করে ফেলবে। খ্যাপা টাইপের [illegible] সেদিকে উঁচু করে ধরল এবং আমি দেখতে পেলাম শোরগোল শুনে মেয়েটির চোখ উত্তেজনায় চক চক করতে শুরু করেছে। তার ভেতরে সে আমার দিকে আঙুল তুলে বলল, "কিন্তু আপনি ভুল। ভুল ভুল ভুল। ছেলেরা যে কাজ পারে মেয়েরাও সেই কাজ পারে। বরং আরো ভালো করে পারে। মেয়েরা প্রাইম মিনিস্টার হতে পারে, ডাকাতও হতে পারে। মেয়েরা হাউজ ওয়াইফ হতে পারে আবার পকেটমারও হতে পারে। ডাক্তারও হতে পারে মার্ডারারও হতে পারে। এস্ট্রোনট হতে পারে সন্ত্রাসীও হতে পারে। মেয়েরা স্টুপিড হতে পারে আবার সায়েন্টিস্টও হতে পারে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে নিজের চোখে দেখেন–"

বলে মেয়েটা তার ব্যাগের ভেতর থেকে একটা কার্ড বের করে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আবার তার যন্ত্রের দিকে তাকাল। পাশে শোরগোল তখন আরো জমে উঠেছে, মানুষ দুইজন তখন হাতাহাতি প্রায় শুরু করে দিয়েছে, তাদের ঘিরে বেশ একটা ভিড় জমে উঠেছে। মেয়েটা তার মাঝে ঠেলেঠুলে তার যন্ত্র নিয়ে ঢুকে গেলো, মনে হয় যখন কেউ মারামারি শুরু করে তখন তাদের গলার স্বরে কী রকম ওভারটোন হয় সেটা ফিল্ড টেস্ট করতে চায়।

মানুষের ভিড়ের সাথে মিশে গিয়ে মেয়েটা যখন চলে গেলো তখন আমি তার কার্ডটার দিকে তাকালাম। ভেবেছিলাম সেখানে তার নাম ঠিকানা টেলিফোন এইসব থাকবে কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখলাম সেখানে কিছু ইংরেজি অক্ষর লেখা। অনেকগুলো ডাব্লিউ, অনেকগুলো ফুলস্টপ এবং পড়তে গেলে দাঁত ভেঙে যাবার অবস্থা। এটা কী কোনো সাংকেতিক নাম ঠিকানা আমার যেটা রহস্যভেদ করতে হবে? মেয়েটা কী আমার বুদ্ধি পরীক্ষা করে দেখতে চাইছে? আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। কী করব বুঝতে না পেরে আমি কার্ডটা আমার পকেটে রেখে দিলাম।

আমার যখন টাকা পয়সা নিয়ে কোনো সমস্যা হয় তখন আমি আমার অর্থনীতিবিদ এক বন্ধুর সাথে কথা বলি, যখন রোগশোকের কোনো ব্যাপার

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

হয় তখন কথা বলি এক ডাক্তার বন্ধুর সাথে, রান্নাবান্না এবং খাওয়া দাওয়া নিয়ে কথা বলতে হলে আমি আমার ছোট খালার সাথে কথা বলি, ধর্ম নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি রাজাকার টাইপের এক মৌলবাদী বন্ধুকে ফোন করি (সে যেটা বলে ধরে নেই তার উল্টোটা হচ্ছে সত্যি) এবং বুদ্ধি সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার থাকলে আমি আমার ভাগ্নে বিল্টুর সাথে কথা বলি। আজকালকার যে কোনো বাচ্চার বুদ্ধি আমাদের থেকে অনেক বেশি আর বিল্টু তাদের মাঝেও এককাঠি সরেস। আমার অ্যাপার্টমেন্টে এসে একবার দেখে বাথরুমে সিংক থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে সে চোখের পলকে মুখ থেকে চিউয়িংগাম বের করে সিংকের ফুটো সেরে দিয়েছিল। দুটো কাগজ ক্লিপ করার জন্য স্ট্যাপলার খুঁজে পাচ্ছি না সে চিউয়িংগাম দিয়ে দুটো কাগজ লাগিয়ে দিল। একবার তার সমবয়সী একজনের সাথে ঝগড়া হয়েছে তখন পিছন থেকে বিল্টু তার চুলে চিউয়িংগাম লাগিয়ে দিল। চাঁদির কাছাকাছি প্রায় ছয় ইঞ্চি জায়গা কামিয়ে সেই চিউয়িংগাম সরাতে হয়েছিল। শুধুমাত্র চিউয়িংগাম দিয়েই সে এতো কাজ করতে পারে– পৃথিবীর অন্য সব জিনিসের কথা ছেড়েই দিলাম। এখন তার বয়স বারো যখন সে বড় হবে তখন কী কী করবে চিন্তা করেই আমি মাঝে মাঝে আনন্দে এবং বেশিরভাগ সময়ে আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠি।

কাজেই মগবাজারের মোড়ে সেই খ্যাপা মহিলার দেয়া কার্ডটির কোনো মর্ম উদ্ধার করতে না পেরে আমি একদিন বিল্টুর কাছে হাজির হলাম। সে একটা কম্পিউটারের সামনে বসে বসে কী একটা টাইপ করছে এবং মুচকি মুচকি হাসছে। বিল্টু যখন মুচকি মুচকি হাসে তখন আমি খুব ভয় পাই। তাই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী রে বিল্টু? তুই এরকম ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছিস কেন?"

"আরাফাতের কাছে একটা ভাইরাস পাঠালাম। এক নম্বরী ভাইরাস– হার্ড ড্রাইভ ক্র্যাশ করে দিবে।"

সে কী বলছে তার কোনো মাথা মুন্ডু আমি বুঝতে পারলাম না। শুধুমাত্র তার মুখের হাসিটি দেখে বুঝতে পারলাম কাজটা ভালো হতে পারে না। তাই মুখে মামাসুলভ একটা গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বললাম, "কাজটা ঠিক হলো না।"

বিল্টু আমার দিকে না তাকিয়ে কম্পিউটারে কিছু একটা টাইপ করতে করতে বলল, "তুমি এসব বুঝবে না মামা।"

"কেন বুঝব না? আমাকে কী গাধা পেয়েছিস না কী?"

বিল্টু আমার কথার উত্তর না দিয়ে কম্পিউটারে টাইপ করতে লাগল, ইঙ্গিতটা খুব স্পষ্ট– আমাকে সে গাধাই মনে করে। আমি তাকে আর না ঘাটিয়ে পকেট থেকে সেই কার্ডটা বের করে তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এইটা কী জানিস?"

বিল্টু কম্পিউটারে টাইপ করতে করতে চোখের কোণা দিয়ে একবার কার্ডটার দিকে তাকাল, কিন্তু কোনো কথা বলল না। আমি একটু অধৈর্য হয়ে বললাম, "কী হলো? কিছু বলছিস না কেন?"

বিল্টু তবুও কথার উত্তর না দিয়ে কম্পিউটারে খুটখাট করতে থাকে– এই যন্ত্রটা মনে হয় আসলেই শয়তানের বাক্স। বিল্টু ছেলেটা দুষ্টু এবং পাজী ছিল কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে দুষ্টু পাজী এবং বেয়াদব হয়ে যাচ্ছে। আমি তার মেজো মামা– তাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, সে সেই কথাটার উত্তর পর্যন্ত দিচ্ছে না। কানে ধরে একটা রদ্দা দিলে মনে হয় সিধে হয়ে যাবে। কিন্তু আজকালকার ছেলেমেয়েদের কানে ধরে রদ্দা দেয়া যায় না। আমি নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, "কী হলো? কথা কানে যায় না? একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দিবি না?"

বিল্টু তার কম্পিউটারে খুটখাট বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "মামা, তুমি যে জিনিসটা জিজ্ঞেস করেছ তার উত্তর দিলে তুমি বুঝবে না।"

"আমি বুঝব না?"

বিল্টু মাথা নাড়ল, "না। তুমি কিছু জান না, বোঝ না– শুধু ভান কর যে সবকিছু জান আর বোঝ।"

আমি রেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, বিল্টু তার সুযোগ দিল না, বলল, "তোমার কার্ডে যেটা লেখা আছে সেটা হচ্ছে একটা ইন্টারনেট ওয়েব সাইটের ইউ. আর. এল। তুমি কিছু বুঝলে?"

আমি আমতা আমতা করে বললাম, "না, মানে ইয়ে–"

"তার মানে তুমি বোঝ নাই।"

"তাই বলে তুই বলবি না?"

"আমি ভাবছিলাম তোমাকে দেখিয়ে দিই।"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

"কীভাবে দেখাবি?"

"সেটাও তুমি বুঝবে না। তার চাইতে তুমি মেজাজ গরম না করে দাঁড়িয়ে থাকো– এক্ষণি কম্পিউটারে এসে যাবে?"

"কোথা থেকে আসবে? কেমন করে আসবে?"

বিল্টু হতাশভাবে মাথা নাড়ল, বলল, "তুমি বুঝবে না মামা, শুধু শুধু চেষ্টা করে লাভ নাই।"

কম্পিউটারে হঠাৎ করে কিছু ছবি চলে এলো আর আমি অবাক হয়ে দেখলাম একটি ছবি হচ্ছে সেই খ্যাপা মেয়েটির, বিদঘুটে একটা যন্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, "এখানে কোথা থেকে এলো এই মেয়ে? কী আশ্চর্য!"

বিল্টু গম্ভীর হয়ে বলল, "মামা তুমি পরে আশ্চর্য হয়ো। এখন যেটা দেখার দেখে নাও। গত মাসে আমার ইন্টারনেট বিল কতো হয়েছিল জান?"

ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিলের কথা শুনেছি কিন্তু ইন্টারনেট বিল আবার কী জিনিস? কম্পিউটারে আরো ছবি আর লেখা বের হতে থাকে। কোনটা ছেড়ে কোনটা পড়ব বুঝতে পারছি না। বিল্টু বলল, "তাড়াতাড়ি মামা। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "তাড়াতাড়ি করাবি না তো? আমি তাড়াতাড়ি কিছু করতে পারি না।"

"সেটা আমি জানি। তুমি হচ্ছো আমাদের ঢিলে ঢালা মামা।"

"ফাজলেমি করবি না।"

"তার চাইতে বলো তুমি কী চাও– আমি বের করে দিই।"

আমি বিদঘুটে যন্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে দেখিয়ে বললাম, "এই যে দেখছিস মেয়েটা– এই মেয়ে হচ্ছে একজন খ্যাপা সায়েন্টিস্ট। এই মেয়ের নাম ঠিকানা টেলিফোন নাম্বারটা দরকার।"

"সেটা আগে বলবে তো!" বিল্টু তার কম্পিউটারে খুটখাট করতে করতে বলল, "তুমি হচ্ছো পুরান মডেলের মানুষ– সেই জন্য তোমার নাম ঠিকানা দরকার! আজকাল মানুষ আর নাম ঠিকানা ব্যবহার করে না।"

"তাহলে কী ব্যবহার করে?"

"ই-মেইল।"

আমি হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, "আমার ই-মেইল উ-মেইলের দরকার নেই– আমার দরকার নাম ঠিকানা।"

"ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে–" বলে বিল্টু একটা কাগজে কিছু একটা লিখে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এই যে তোমার নাম ঠিকানা। তুমি এখন বিদায় হও মামা। তুমি বড় ডিস্টার্ব করো।"

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন মামাদের পিছনে ঘুরাঘুরি করতাম। তারা মাঝে মাঝে ধমক দিয়ে বলতেন, "ভাগ এখান থেকে, ডিস্টার্ব করবি না।" এখন আমার ভাগ্নে আমাকে বলে তাকে ডিস্টার্ব না করতে! আস্তে আস্তে দুনিয়াটা কী হয়ে যাচ্ছে?

বাসাটা খুঁজে বের করতে আমার কালো ঘাম ছুটে গেলো, যারা বাসার নম্বর দেয় তারা নিশ্চয়ই গুণতে জানে না। গুণতে জানলে কী কখনো বাহাত্তরের পর ছেচল্লিশ তারপর উনাশি হতে পারে? বাসাটা কিছুতেই খুঁজে না পেয়ে মোড়ের পান-সিগারেটের দোকানে জিজ্ঞেস করলাম, মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম কোনো লাভ হবে না কিন্তু দেখলাম কম বয়সী দোকানদার একবারেই চিনে ফেলল, চোখ বড় বড় করে বলল, "ও সায়রা সাইন্টিস্টের বাসা?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "সায়রা সায়েন্টিস্ট?"

"ও! আপনি জানেন না বুঝি?" মানুষটা তার সবগুলো দাঁত বের করে হেসে বলল, "আপা হচ্ছেন ওস্তাদ মানুষ। কালা ছগীরকে একদিন কী টাইট না দিলেন!"

"টাইট?"

"জে।" মানুষটা উৎসাহ নিয়ে বলতে শুরু করল, "আপার এই রকম একটা যন্ত্র আছে, দেখে মনে হয় মোবাইল টেলিফোন। সেই যন্ত্রে টিপি দিলেই ইলেকটিরিক বের হয়। কালা ছগীর বুঝে নাই, নেশা করবে টাকা নাই, আপার ব্যাগে ধরে দিছে টান।"

"তারপর?"

"আপা বলছে খামোস! তারপর যন্ত্রে দিছে টিপি। ইলেকটিরিক দিয়ে কালা ছগীরের জান শেষ। খালি কাটা মুরগির মতো তড়পায়–" দৃশ্যটা চিন্তা করে মানুষটা আনন্দে হাসতে থাকে।

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "সেই আপার বাসাটা কোথায়?"

"সোজা চলে যান, তিন বাসা পরে হাতের ডানদিকে দোতালা বাসা, সবুজ রংয়ের গেইট।" মানুষটা একটা চোখ ছোট করে বলল, "তয় একটা জিনিস সাবধান!"

"কী জিনিস?"

"আপার সাথে কুনু দুই নম্বুরী কাজ করার চেষ্টা করবেন না। করলে কিন্তু–" মানুষটা হাত দিয়ে গলায় পোঁচ দেবার মতো ভঙ্গি করে বুঝিয়ে দিল 'আপা' আমাকে খুন করে ফেলবে।

আমি বললাম, "না, কোনো এক নম্বুরী কাজ করারই সাহস পাই না, দুই নম্বুরী কাজ করব কেমন করে– তাও সাধারণ একজন মানুষের সাথে না, খ্যাপা একজন বিজ্ঞানীর সাথে? যে শুধু বিজ্ঞানী না, মহিলা বিজ্ঞানী এবং যে যন্ত্রে টিপ দিয়ে কালা ছগীরকে পর্যন্ত কাবু করে ফেলে!"

এবারে বাসাটা খুঁজে পেতে কোনো সমস্যা হলো না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেল টিপে দিলাম, মনে হলো ভেতরে কোথাও একটা বিচিত্র শব্দ হলো। আমি কান পেতে শোনার চেষ্টা করি, চাপা একটা ভুট ভাট শব্দ হচ্ছে, কিসের শব্দ বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ করে একটা বিকট শব্দ হলো এবং সাথে সাথে একটা মেয়ের গলা শুনতে পেলাম, মনে হলো রেগে গিয়ে কাউকে বকাবকি করছে। আমি ইতস্তত করে আবার বেলে চাপ দিতেই খুট করে দরজা খুলে গেলো, কালি ঝুলি মাখা একটি মাথা উঁকি দিয়ে আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল।

মগবাজারের মোড়ের সেই মেয়েটিই, তবে তাকে দেখতে এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছে। সেদিন শাড়ি পরেছিল, আজকে পুরুষ মানুষের মতো একটা ওভারওল পরেছে। তার অনেকগুলো পকেট আর সেই পকেট থেকে নানা সাইজের স্ক্রু ড্রাইভার, প্লায়ার্স, রুলার, পেন্সিল, ফ্ল্যাশ লাইট, সল্ডারিং আয়রন এইসব বের হয়ে আছে। কোমরে একটা বেল্ট, সেই বেল্ট থেকে একটা বড় হাতুরি ঝুলছে। মেয়েটির মাথায় টকটকে লাল রংয়ের একটা রুমাল বাঁধা, শুধুমাত্র সেটা থাকার কারণেই তাকে দেখতে একটা মেয়ের

মতো লাগছে, ঠিক করে বললে বলতে হয় একটা জিপসি মেয়ের মতো। আমি মেয়েটির কালি ঝুলি মাখা মুখের দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করে বললাম, "আমাকে চিনতে পারছেন? আমি মানে ইয়ে– ঐ যে সেদিন মগবাজারে–"

মেয়েটা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ চিনেছি– আসেন, ভেতরে আসেন। আমি তখনই বুঝছিলাম আপনি আসবেন।"

"কেমন করে বুঝেছিলেন?"

"আপনার চোখ দেখে। আপনার চোখে ছিল অবিশ্বাস। আপনি ভেবেছিলেন আমি মিথ্যে কথা বলছি। তাই আপনি নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিলেন। ঠিক বলেছি কী না?"

আমি জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললাম– "না-না-না। আপনি একেবারেই ঠিক বলেননি। আমি আপনাকে কখনোই অবিশ্বাস করিনি। আসলে ইয়ে–মানে সত্যি কথা বলতে কী–"

ঠিক তখন ভিতরে আবার 'ভুশ' করে একটা শব্দ হলো এবং আমার মনে হলো সারা ঘরে ডালে ফোড়ন দেয়ার মতো একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। সায়রা মাথা নেড়ে কেমন যেন হতাশ হবার ভঙ্গি করে পা দিয়ে মেঝেতে একটা লাথি দিল। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "কী হয়েছে?"

"আমার যন্ত্রটার সেফটি ভাল্ব কাজ করছে না, একটু প্রেসার বিল্ড আপ করলেই লিক করছে। গন্ধ পাচ্ছেন না?"

আমি মাথা নাড়লাম, ইতস্তত করে বললাম, "কিন্তু গন্ধটা তো কেমন যেন ডালে ফোড়ন দেয়ার মতো–"

"হ্যাঁ, এটা ডাল রান্না করার মেশিন।"

"ডাল রান্না করার মেশিন?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "ডাল রান্না করতে মেশিন লাগে?"

"ব্যবহার করলেই লাগে।" সায়রা কঠিন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এবারে লেকচার শুরু করে দেন– মেয়েরা কিছু পারে না, তাদের চিন্তা ভাবনা রান্নাঘরের বাইরে যেতে পারে না– হ্যানো তেনো–"

আমি হাত নেড়ে বললাম, "না-না, এটা আপনি কী বলছেন! আমি সেটা কেন বলব? তবে–"

"তবে কী?"

"এতো জিনিস থাকতে আপনার ডাল রাঁধার মেশিন তৈরি করার আইডিয়া কেমন করে হলো?"

"এটা আপনারা বুঝবেন না।"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

"চেষ্টা করে দেখেন, বুঝতেও পারি।"

"আপনারা– পুরুষ মানুষেরা মেয়েদেরকে রান্নাঘরে আটকে রাখতে চান। ভাত রাঁধো, ডাল রাঁধো, মাছ মাংস সবজি রাঁধো– আপনাদের ধারণা রান্নাবান্না করাই আমাদের একমাত্র কাজ। সেজন্য আমি রান্না করার মেশিন তৈরি করছি।"

"রান্না করার মেশিন?"

"হ্যাঁ। ডাল দিয়ে শুরু করেছি। আস্তে আস্তে সবকিছু হবে। সকালে উঠে সুইচ টিপে দেবেন, দুপুর বেলা সবকিছু রান্না হয়ে যাবে। ভাত ডাল মাছ মাংস। মেয়েদের তখন রান্নাঘরে আটকা থাকতে হবে না।"

আমি মাথা চুলকালাম, যুক্তিটার মাঝে কিছু গোলমাল আছে মনে হলো কিন্তু এখন সেটা নিয়ে কথা বলা মনে হয় ঠিক হবে না। আমি ইতস্তত করে বললাম, "আমি আসলে এসেছিলাম–"

সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, কী বলছিলেন যেন?"

"আসলে ইন্টারেস্টিং মানুষ দেখতে, তাদের সাথে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে বোরিং। খায় দায়, চাকরি করে আর ঘুমায়।"

"আমি ইন্টারেস্টিং?"

"অবশ্যি। ডাল রান্না করার মেশিন আবিষ্কার করছে সেরকম মানুষ বাংলাদেশে কতোজন আছে?"

সায়রা মুখটা গম্ভীর করে বলল, "আমি ভেবেছিলাম কাজটা সহজ হবে। কিন্তু আসলে মহা কঠিন। টেম্পারেচার ঠিক হওয়ার আগে যদি ডাল ঢেলে দেয়া হয়–" কথা শেষ হবার আগেই আবার ভুশ করে একটা শব্দ হলো এবং এবারে সাথে সাথে সারা ঘরে একটা পোড়া ডালের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "একটু দাঁড়ান। মেশিনটা বন্ধ করে দিয়ে আসি।"

"আমি আসি আপনার সাথে?"

"আসবেন? আসেন।"

আমি সায়রার পিছু পিছু গেলাম, বড় একটা ঘরের মাঝামাঝি বিশাল একটা যন্ত্র। নানারকম পাইপ বের হয়ে আছে। মাঝখানে নানা রকম আলো জ্বলছে এবং নিভছে। স্বচ্ছ একটা জায়গায় হলুদ রংয়ের কিছু একটা ভুটভাট [illegible] একটা টিউব দিয়ে কালো ধোঁয়ার মতো কিছু একটা বের হচ্ছে। সায়রা কোথায় টিপে ধরতেই নানা রকম শব্দ করে যন্ত্রটা থেমে গেলো এবং ঘরের মাঝে এক ধরনের নৈঃশব্দ নেমে এলো। ঠিক তখন মনে হলো কে যেন খিক খিক করে হাসছে। সায়রা পিছনে ফিরে ধমক দিয়ে বলল, "খবরদার হাসবি না এরকম করে"। সাথে সাথে হাসির শব্দ থেমে গেলো। আমি মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকালাম, কেউ নেই ঘরে, কার সাথে কথা বলছে মেয়েটি?

আমি সায়রার দিকে তাকিয়ে বললাম, "কার সাথে কথা বলছেন?"

সায়রা মনে হলো আমার প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে চাইছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইতস্তত করে বলল, "জরিনির সাথে।"

"জরিনি? জরিনি কে?"

"ইঁদুর। ঐ যে দেখেন–"

আমি পিছনে তাকিয়ে দেখি একটা ছোট খাঁচা এবং সেখানে একটা ছোট নেংটি ইঁদুর ঠিক মানুষের মতো দুই হাত বুকে ভাঁজ করে দুই পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। কানে দুল এবং গলায় মালা। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে হলো ইঁদুরটার মুখে ফিচলে এক ধরনের হাসি। আমি অবাক হয়ে জরিনির দিকে তাকিয়ে বললাম, "এই ইঁদুরটা হাসছিল? ইঁদুর মানুষের মতো হাসতে পারে?"

"পারে না।" জরিনি মাথা নাড়ল, "ইঁদুরের ভোকাল কর্ড ছোট, শব্দ বের হয় অন্যরকম।"

"কিন্তু আমি যে হাসতে শুনলাম?"

"হাসির শব্দ টেপ করা আছে। যখন হাসার ইচ্ছে করে তখন সুইচ টিপে দেয়। বেটি মহা ফাজিল হয়েছে। যখনই আমার কিছু একটা গোলমাল হয় তখন ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে।"

আমি অবাক হয়ে সায়রার দিকে তাকালাম, কী বলছে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, হঠাৎ করে মনে হতে থাকে মেয়েটার হয়তো একটু মাথা খারাপ। সায়রা আমার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা দেখে বলল, "আমার কথা বিশ্বাস করলেন না?"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

আমি বললাম, "মানুষ একটা জিনিস বিশ্বাস করে কিংবা অবিশ্বাস করে কথাটা বোঝার পর। আপনি কী বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

সায়রা মাথা নাড়ল, বলল, "বোঝার কথা না।"

"একটু বুঝিয়ে দেন।"

সায়রা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি আবার কাউকে বলে দেবেন না তো?"

"আপনি না করলে বলব না। কিন্তু মানুষকে বলার জন্য এর চাইতে মজার গল্প আর কী হতে পারে?"

"যত মজারই হোক আপনি কাউকে বলবেন না।"

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "ঠিক আছে বলব না।"

সায়রা ইঁদুরটার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই যে ইঁদুরটা দেখছেন, এটার আই কিউ একশ' বিশের কাছাকাছি। যার অর্থ এর বুদ্ধি আমাদের দেশের মন্ত্রীদের থেকে বেশি। আপনি বলতে পারেন সেটা খুব বেশি না– কিন্তু একটা ইঁদুরের জন্য সেটা অনেক। এটা অনেক শব্দ বুঝতে পারে– কথা বলতে পারে না কিন্তু সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে মোটামুটি বুঝিয়ে দিতে পারে। আমি মোটামুটি কিছু শব্দ তৈরি করে মাইক্রো সুইচে সাজিয়ে দেব বলে ঠিক করেছিলাম কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক হবে না।"

"কেন?"

"ছেমড়ি মহা ফাজিল। খাবার দিতে একটু দেরি হলেই ধমকা ধমকি শুরু করে দেয়!"

আমি ঢোক গিলে বললাম, "তাজ্জবের ব্যাপার! কোথায় পেলেন এই চিজ?"

সায়রা আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলল, "পাব আবার কোথায়? আমি তৈরি করেছি।"

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "তৈরি করেছেন? ইঁদুর তৈরি করা যায়?"

"ইঁদুর তৈরি করিনি। ইঁদুর তো ইঁদুরই– সেটা আবার তৈরি করে কেমন করে। এর বুদ্ধিটা তৈরি করেছি।"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "কেমন করে তৈরি করলেন?"

"সেটা অনেক লম্বা ইতিহাস।" সায়রা সেই ইতিহাসের সমান লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "বলতে পারেন, এটা হচ্ছে দ্রুত এবং নিয়ন্ত্রিত বিবর্তন। বিবর্তন কী জানেন তো?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "একটু একটু জানি।"

"একটু জানলেই হবে। পৃথিবীর যত প্রাণী আছে, যত জীবজন্তু আছে সবার মিউটেশান হয়। নানা কারণে সেই মিউটেশান হতে পারে– রেডিয়েশান, এনভায়রনমেন্ট বা অন্যান্য ব্যাপার। সেই মিউটেশানের কারণে কোনো কোনো প্রাণী হয় ভালো– কোনো কোনোটা হয় খারাপ। যেটা খারাপ হয় সেটা টিকে থাকতে পারে না– যেটা ভালো সেটা পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে টিকে থাকতে পারে। এভাবে বিবর্তন এগিয়ে যায়– ধীরে ধীরে জীবজন্তুর পরিবর্তন হয়। সেটা হতে লক্ষ বছর লেগে যায়।"

সায়রা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি এই বিবর্তনের ব্যাপারটার মাঝে দুটো জিনিস করেছি। এক : মিউটেশানের জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভর না করে হালকা ডোজ রেডিয়েশন দেয়া শুরু করেছি এবং দুই : বেছে বেছে যারা সুপিরিয়র তাদের রিপ্রোডিউস করেছি। রেডিয়েশনের জন্যে একটা খুব হালকা সিজিয়াম ওয়ান থার্টি এইট গামা সোর্স ব্যবহার করেছি।" সায়রা থেমে গিয়ে বলল, "কাউকে বলে দেবেন না যেন!"

আমি বললাম, "সেটা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না– কী বলছেন সেটার মাথামুন্ডু আমি কিছু বুঝিনি। সিজি আম আর ফজলি আমের মাঝে কী পার্থক্য সেটাও আমি জানি না।"

সায়রা বিজ্ঞানীদের খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণে বিরক্ত হয়ে বলল, "এটা কোনো আম না। এটা হচ্ছে এক ধরনের এলিমেন্ট। সিজিয়াম। আর সিজিয়াম ওয়ান থার্টি এইট হচ্ছে রেডিও একটিভ এলিমেন্ট। যাই হোক যেটা বলছিলাম, রেডিয়েশান দিয়ে মিউটেশান করে আমি অনেকগুলো ইঁদুরের বাচ্চা দিয়ে কাজ শুরু করলাম। সবগুলোকে একটা খাঁচায় রেখে তাদের একটা বুদ্ধির পরীক্ষার মাঝে ফেলে দিলাম। যে ইঁদুর একটা ছোট বলকে ঠেলে একটা গোল গর্তের মাঝে ফেলতে পারবে সে ভালো খাবার পাবে। বেশির ভাগই বুদ্ধির পরীক্ষায় ফেল করল– যারা পাস করল তাদের নিয়ে ইঁদুরের সংসার শুরু হলো। আবার লো-ডোজ রেডিয়েশান, আবার

বাচ্চা-কাচ্চা এবং বাচ্চা-কাচ্চার ওপর আবার নতুন করে বুদ্ধির পরীক্ষা, এবার পরীক্ষা আগের থেকেও কঠিন। ছোট একটা ত্রিভুজকে তিনকোণা একটা গর্তে ফেলতে হবে আর ছোট একটা চতুর্ভুজকে চারকোণা একটি গর্তে ফেলতে হবে!"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

সায়রা নিঃশ্বাস নেবার জন্য একটু থামতেই আমি বললাম, "ইঁদুরে ত্রিভুজ চতুর্ভুজ বুঝতে পারে? আমিই তো পারি না।"

সায়রা গলা নামিয়ে বলল, "আস্তে আস্তে বলেন। জরিনি বেটি শুনতে পেলে দেমাগে মাটিতে পা পড়বে না! যাই হোক যেটা বলছিলাম, বুদ্ধির পরীক্ষায় এবারে যেগুলো পাস করল আবার সেগুলোকে নিয়ে নতুন ইঁদুরের সংসার! আবার তাদেরকে নতুন রেডিয়েশান ডোজ– নতুন মিউটেশান নতুন বুদ্ধির পরীক্ষা! বুঝতে পেরেছেন?"

যারা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনে তারা বিশ্বাস নাও করতে পারে কিন্তু আমি সত্যি সত্যি টেকনিকটা বুঝে গেলাম। চোখ বড় বড় করে বললাম, "এভাবে অনেকবার করে ইঁদুরদের আইনস্টাইনকে বের করে ফেলেছেন?"

মেয়েটি ফিক করে হেসে বলল, "বলতে পারেন ইঁদুরদের আইনস্টাইন। শুধু একটা সমস্যা–"

"কী সমস্যা?"

"বুদ্ধির পরীক্ষা যখন কঠিন থেকে কঠিন হতে লাগল তখন পরীক্ষায় পাস করতে লাগল অল্প অল্প ইঁদুর। সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় পাস করেছে মাত্র একটা ইঁদুরী।"

"ইঁদুরী?"

"হ্যাঁ। মানে মেয়ে ইঁদুর। তার সাথে সংসার করবে সেরকম বুদ্ধিমান ছেলে ইঁদুর আর পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই আমি আর আগাতে পারছি না। একটা মেয়ে ইঁদুরী নিয়ে বসে আছি। সেই ইঁদুরী মহা ফাজিল, আমার সাথে এমন সব কান্ড করে সেটা আর বলার মতো নয়!"

কী কান্ড করে সেটা না বলে মেয়েটা খুব একটা হতাশার ভঙ্গি করে মাথা নাড়তে লাগল। আমি এবারে ইঁদুরের খাঁচাটার দিকে এগিয়ে গেলাম, ছোট একটা নেংটি ইঁদুর দুই হাত বুকে ভাঁজ করে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখে তড়াক করে ভেতরে ঢুকে গেলো। সেখানে ছোট একটা ঘরের মতো, তার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে টুক করে লাইট জ্বালিয়ে দিল। একটু পরে

শুনলাম ভিতর থেকে একটা হিন্দি গানের সুর ভেসে আসছে, "লটপট লটপট সাইয়া সাইয়া কাহা...।"

সায়রা আমার দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলল, "আপনাকে নতুন মানুষ দেখেছে তো তাই একটু রং দেখাচ্ছে!"

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, হঠাৎ করে অন্য পাশ দিয়ে একটা দরজা খুলে গেলো আর একটা খেলনা গাড়িতে করে ইঁদুরটা বের হয়ে এলো– খাঁচার চারপাশে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে সেটা আবার ভেতরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। হিন্দি গান বন্ধ হয়ে এবারে ইংরেজি গান শুরু হয়ে গেলো। সায়রা বলল, "চলেন এখান থেকে যাই। আপনি যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ এই বেটি ঢং করতেই থাকবে!"

আমি বললাম, "কানে দুল পরেছে। গলায় মালা?"

"কানের দুলটি আমি পরিয়েছি– ওটা আসলে একটা মাইক্রোওয়েভ ট্র্যাকিং ডিভাইস। মালাটা নিজেই পরেছে। চলেন বের হই।"

আমি একেবারে হতবাক হয়ে মেয়েটার পিছু পিছু বের হয়ে এলাম, নিজের চোখে না দেখলে এটা বিশ্বাস করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার! একটা ইঁদুরকে যদি এরকম বুদ্ধিমান করে ফেলা যায় তাহলে মানুষকে কী করে ফেলা যাবে?

সায়রা সায়েন্টিস্টের বাসা থেকে আমি সন্ধ্যে বেলা ফিরে এলাম। আসার আগে আমি আমার ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর দিয়ে বললাম, যদি জরিনিকে নিয়ে কিংবা অন্য কোনো কিছু নিয়ে কিছু একটা ঘটে আমাকে জানাতে। সায়রা আমার কাছে জানতে চাইল আমার ই-মেইল অ্যাড্রেস কী– শব্দটা বিল্টুর কাছে শুনেছি কিন্তু ব্যাপারটা কী আমি সেটাই জানি না। তাই আমতা আমতা করে বললাম যে, খোঁজ-খবর নিয়ে তাকে নিশ্চয়ই জানাব।

আমার জটিল সমস্যা হলে আমি বিল্টুর কাছে যাই, কাজেই এবারেও আমি বিল্টুর কাছে হাজির হলাম– এবারেও দেখি সে কম্পিউটারের সামনে বসে আছে। আমাকে দেখে তার মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হওয়ার বদলে কেমন যেন ফিউজড্ বাল্বের মতো নিভে গেলো। শুধু তাই নয়, মুখটা প্যাঁচার মতো করে বলল, "মামা, তুমি আবার এসেছ?"

আমি একটু রেগে উঠে বললাম, "তোরা এমন হয়েছিস কেন? আমরা যখন ছোট ছিলাম মামারা এলে কতো খুশি হতাম, তোরা আমাদের [illegible] করে ফেলিস!"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

[illegible] জিনিস করতো– তোমরা শুধু সমস্যা নিয়ে আসো। বলো এখন তোমার কী সমস্যা।"

আমি ভাবলাম বলি যে কোনো সমস্যা নেই, এমনিতে তাকে দেখতে এসেছি। কিন্তু সেটা বলে আরো সমস্যায় পড়ে যাব। তাই সত্যি কথাটাই বললাম, "ঠিক আছে যা। তোর কাছে আর সমস্যা নিয়ে আসব না। এই শেষ।"

"বলো।"

"ই-মেইল জিনিসটা কী? তার অ্যাড্রেস কেমন করে পেতে হয়?"

বিল্টু এমন ভাব করতে লাগল যেন আমার কথা শুনতেই পায়নি, কম্পিউটারে খুটখুট করতে থাকে। আমি গলা খাকাড়ি দিয়ে বললাম, "শুনেছিস আমার কথা?"

"শুনছি। বলে যাও।"

"আর এই জিনিসটার নাম ই-মেইল কেন? এটাকে অ-মেইল বা আ-মেইল না বলে ই-মেইল কেন বলে?"

বিল্টু কম্পিউটারে খুটখুট করতে থাকে। আমি মাথা চুলকে বললাম, "এইটা কী রেলওয়ের ব্যাপার? কোনো মেইল ট্রেনের সাথে যোগাযোগ আছে? কোনো স্টেশনের ঠিকানা? তাহলে স্টেশনটা কোথায়?"

বিল্টু চোখের কোণা দিয়ে একবার আমাকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ছিমছাম পরিষ্কার মহিলারা তেলাপোকা দেখলে মুখটা যেরকম করে, তার মুখটা হলো অনেকটা সেরকম। আমি বললাম, "কী হলো? মুখটা এরকম প্যাঁচার মতো করছিস কেন?"

"আমার অনুরোধ তুমি এইসব ব্যাপার নিয়ে কখনো কারো সাথে কথা বলবে না। আর যদি বলতেই চাও, খবরদার কোনোভাবে বলবে না তুমি আমার মামা। যদি বলো–"

আমি গরম হয়ে বললাম, "যদি বলি?"

"যদি বলো তাহলে আমার সুইসাইড করতে হবে। তুমি কী চাও তোমার একটা ভাগনে মাত্র বারো বছর বয়সে সুইসাইড করে ফেলুক?"

"কেন? তোকে সুইসাইড করতে হবে কেন?"

"যে মামা মনে করে ই-মেইল একটা মেইল ট্রেন তার ভাগনেদের সুইসাইডই করা উচিত।" বিল্টু আমার দিকে তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, "মামা, তুমি কী আফগানিস্তানে থাক? কোনোদিন পত্রিকা পড় না? রাস্তাঘাটে হাঁটো না? দুনিয়ার খবর রাখে এরকম একজন মানুষকেও চিনো না? তোমার হয়েছেটা কী?"

আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, "দেখ, বেশি পাকামো করবি না। একটা জিনিস জিজ্ঞেস করেছি জানলে বল, না জানলে সোজাসুজি বলে দে জানি না। এতো ধানাই পানাই কিসের?"

"মামা। আমি মোটেই ধানাই পানাই করছি না। ধানাই পানাই করছ তুমি। যাই হোক– তোমার সাথে কথা বলা হচ্ছে সময় নষ্ট করা। তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি কম্পিউটার কয় রকম, তুমি কী বলবে জান?"

"কী বলব?"

"তুমি বলবে দুই রকম। এক রকম হচ্ছে কম-পিউটার আরেক রকম হচ্ছে বেশি-পিউটার।" কথা শেষ করে বিল্টু খুব একটা রসিকতা করে ফেলেছে এরকম ভান করে দাঁত বের করে হি হি করে হাসতে লাগল।

আমার এমন রাগ হলো সেটা আর বলার মতো নয়, ইচ্ছে হলো ঘাড়ে ধরে একটা দাবড়ানি দেই। আজকালকার ছেলেপিলেরা শুধু যে ফাজিল হয়েছে তা নয়, বড়দের মান-সম্মান রেখেও কথা বলতে পারে না। আমি গম্ভীর হয়ে মেঘের মতো গর্জন করে বললাম, "ঠিক আছে। তুই যদি আমাকে বলতে না চাস বলিস না। তুই ভাবছিস আমি এটা অন্য কোনোখান থেকে জানতে পারব না?"

বিল্টু এবারে একটু নরম হয়ে বলল, "আহাহা-মামা, তুমি এতো রেগে যাচ্ছ কেন? আমি তোমাকে বলছি ই-মেইলটা কী। এটা অ আ ই-এর ই না, এটা ইলেকট্রনিক-এর ই। ই-মেইল হচ্ছে ইলেকট্রনিক মেইল। অর্থাৎ কাগজে লিখে খামে ভরে স্ট্যাম্প লাগিয়ে চিঠি না পাঠিয়ে কম্পিউটার আর নেটওয়ার্ক দিয়ে যে চিঠি পাঠানো যায় সেটাই হচ্ছে ই-মেইল। ই-মেইল পাওয়ার জন্য আর পাঠানোর জন্য যে ঠিকানা ব্যবহার করে সেটা হচ্ছে ই-মেইল অ্যাড্রেস। এখন বুঝেছ?"

পুরোপুরি বুঝতে পারলাম না কিন্তু তবুও সবকিছু বুঝে ফেলেছি এরকম একটা ভান করে বললাম, "বুঝেছি।"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

বিল্টু এক টুকরা কাগজে কুটকুট করে কী একটা লিখে আমাকে দিয়ে বলল, "এই নাও।"

"এটা কী?"

"তোমার ই-মেইল অ্যাড্রেস।"

"আমার ই-মেইল অ্যাড্রেস? কোথেকে এলো?"

"আমি তৈরি করে দিলাম।"

"তুই তৈরি করে দিলি? কখন তৈরি করলি? কেমন করে তৈরি করলি?"

"এই তো এখন। তোমার সাথে কথা বলতে বলতে।"

আমি বিল্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম সে আমার সাথে ঠাট্টা করছে কী না– কিন্তু মুখে ঠাট্টার চিহ্ন নেই, সব সময় মুখে যে ফিচলে হাসি থাকে সেটাও নেই– বেশ গম্ভীরভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি আমতা আমতা করে বললাম, "তুই কেমন করে তৈরি করে দিলি? তুই কী পোস্ট মাস্টার না কী যে সবাইকে ই-মেইল অ্যাড্রেস তৈরি করে দিবি?"

বিল্টু চোখ উল্টিয়ে বলল, "তোমাকে সেটা বোঝানো খুব কঠিন মামা। চেষ্টা করে লাভ নেই। তুমি ই-মেইল কী জানতে চেয়েছিলে আমি সেটা তোমাকে বলে দিলাম, একটা তৈরিও করে দিলাম! এখন তুমি সারা পৃথিবীতে যে কোনো মানুষের কাছে ই-মেইল পাঠাতে পারবে আবার সারা পৃথিবীর যে কোনো মানুষের কাছ থেকে ই-মেইল পেতেও পারবে।"

"কতো টাকা লাগে ই-মেইল পাঠাতে?"

"কোনো টাকা লাগে না। ফ্রী। ইন্টারনেট থাকলেই পারবে।"

"ফ্রী?" আমার বিশ্বাস হলো না, পৃথিবীতে আবার ফ্রী বলে কিছু আছে না কী! বললাম, "ফ্রী হবে কেমন করে?"

"হ্যাঁ মামা ফ্রী। বিশ্বাস না হলে দেখো একটা ই-মেইল পাঠিয়ে। কোথায় পাঠাবে বলো।"

আমি পকেট থেকে সায়রা সায়েন্টিস্টের সেই কাগজটা বের করে দিলাম, বিল্টু সেখান থেকে দেখে কম্পিউটারে খুটখুট করে কিছু একটা লিখে বলল, "বলো তুমি কী লিখতে চাও।"

আমি বললাম, "যেটা লিখব সেটাই চলে যাবে?"

"হ্যাঁ, ইংরেজিতে লিখতে হবে। বলো।"

আমি কেশে গলা পরিষ্কার করে ইংরেজিতে বললাম, "প্রিয় সায়রা সায়েন্টিস্ট, আমার শুভেচ্ছা নেবেন–"

বিল্টু কিছু না লিখে বসে রইল। আমি বললাম, "লিখছিস না কেন?"

"তুমি আগে বলে শেষ করো।"

"পুরোটা মনে থাকবে তোর?"

"তুমি আগে বলো তো!"

আমি আবার কেশে গলা পরিষ্কার করে ইংরেজিতে বলতে শুরু করলাম, "প্রিয় সায়রা সায়েন্টিস্ট আমার শুভেচ্ছা নেবেন। আশা করি কুশলেই আছেন। আপনি সেদিন আমার ই-মেইল অ্যাড্রেস জানতে চেয়েছিলেন। শুনে সুখী হবেন যে, আমার একটি ই-মেইল অ্যাড্রেস হয়েছে। আপনাকে সেই অ্যাড্রেস থেকে একটি ই-মেইল পাঠাচ্ছি। এটি পেলে আমাকে জানাতে দ্বিধা করবেন না। তাহলে আমি বুঝতে পারব আপনি আমার ই-মেইলটি পেয়েছেন। আপনার সুস্বাস্থ্য এবং সাফল্য কামনা করছি। ইতি আপনার গুণমুগ্ধ জাফর ইকবাল।"

বিল্টু খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে খুটখুট করে কিছু একটা লিখে ফেলল। আমি বললাম, "কী লিখেছিস?"

"তুমি যেটা বলেছ।"

"আমি তো কতো কী বললাম– তুই তো লিখেছিস মাত্র একটা শব্দ। আমি কী তোকে একটা শব্দ বলেছি?"

বিল্টু আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "মামা, এটা ফ্রী সেই জন্যে তোমাকে উপন্যাস লিখতে হবে না। ই-মেইলে মানুষ কখনো ভ্যাদর ভ্যাদর করে না। কখনো ফালতু একটা শব্দও বলে না! তুমি যে এতো কিছু বলেছ তার মাঝে একটা কথাই জরুরি। সেটা হচ্ছে ই-মেইলটা পেয়েছ কী না জানাও। আমি সেটাই এক শব্দে লিখেছি। 'একনলেজ'-এর আগে-পিছে কিছু দরকার নাই।"

"নাম লিখবি না?"

"নাম নিজে থেকে চলে যাবে।"

"শুভেচ্ছা দিবি না?"

"ই-মেইলে কেউ বাজে কথা লিখে না।"

"শুভেচ্ছা বাজে কথা হলো?"

বিল্টু গম্ভীর গলায় বলল, "ই-মেইলে শুভেচ্ছা বাজে কথা। মানুষ শুধুমাত্র বাজে কথা লিখে। [illegible] পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত–"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

আমি গরম হয়ে বললাম, "আমার সাথে ফাজলেমি করবি না। যা যা বলেছি সব কিছু লেখ।"

বিল্টু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কেন খামোখা লিখব? তোমার ই-মেইল চলে গেছে।"

আমি আঁতকে উঠে বললাম, "চলে গেলো মানে? কখন গেলো? কীভাবে গেলো?"

"আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। এতক্ষণে যেখানে যাবার কথা সেখানে চলে গেছে।"

আমি কিছুক্ষণ বিল্টুর দিকে চোখ পাকিয়ে থাকলাম। মানুষের চোখ থেকে সত্যিকার আগুন বের হলে এতক্ষণে এই ফাজিল ছেলেটি পুড়ে কাবাব হয়ে যেতো। কী করব বুঝতে না পেরে আমি তাকে সেখানে রেখে রান্নাঘরের দিকে রওনা দিলাম, আমার বোনকে মনে হয় জানানো উচিত যে তার ছেলে এখনই পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

আমার বোন চুলোর ওপর ডেকচিতে কী একটা ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। আমাকে বলল, "না খেয়ে যাস নে। রান্না প্রায় হয়ে গেছে।"

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, "আর খাওয়া!"

"কোনদিন থেকে তুই খাওয়ার ওপর এরকম দার্শনিক হয়ে গেলি?"

"না তা হইনি।" আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, "বিল্টুর সাথে একটু কথা বলছিলাম।"

আমার বোন ডেকচির ভেতরের জিনিসটাকে ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলল, "বিল্টু হতভাগার কথা আর বলিস না। দিন-রাত কী একটা শয়তানের যন্ত্র আছে কম্পিউটার– সেটা নিয়ে পড়ে থাকে।"

"তাই না কী?"

"হ্যাঁ নাওয়া নাই খাওয়া নাই পড়াশোনা নাই খেলাধুলা নাই– চব্বিশ ঘন্টা এই কম্পিউটার!"

আমি নাক দিয়ে একটা শব্দ করলাম।

"বুঝলি ইকবাল, আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। এই শয়তানের বাক্স আমি গুঁড়ো করে ফেলে দেব।"

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "ঠিকই বলেছ আপা। ব্যাপারটা মনে হয় [illegible] দরকার।"

আমার বোন ডেকচির জিনিসটা ঘাঁটাঘাঁটি বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই-ই পারবি।"

"কী পারব?"

"বিল্টুর এই নেশা ছুটাতে। তোকেই দায়িত্ব দিচ্ছি। এক ধমক দিয়ে সিধে করে দে–"

আমি চমকে উঠে বললাম, "আমি?"

"হ্যাঁ। ওকে বোঝা যে এটা হচ্ছে শয়তানের বাক্স। এটা যারা ব্যবহার করে তারা হচ্ছে বড় শয়তান!"

"বড় শয়তান?"

"হ্যাঁ!"

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখন বিল্টু তার ঘর থেকে চিৎকার করে বলল, "মামা! তোমার ই-মেইলের উত্তর এসেছে!"

আমার বোন কোমরে হাত দিয়ে বলল, "কী বলছে পাজিটা? তোর ই-মেইল আসছে? তোকেও ভজিয়ে ফেলেছে? তুইও বিল্টুর সাথে তাল দিচ্ছিস? ঘরের শত্রু বিভীষণ? হ্যাঁ–"

বোনের চোখ লাল হওয়ার আগেই আমি সুড়ুৎ করে রান্নাঘরের দরজা থেকে সরে গেলাম। বিল্টুর কাছে যেতেই সে কম্পিউটারের মনিটরের দিকে দেখালো, সেখানে তিনটা ইংরেজি শব্দ, "জরুরি। দেখা করুন।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "এর মাঝে উত্তরও চলে এসেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করে হতে পারে– এই মাত্র না পাঠালি?"

"হ্যাঁ মামা, ই-মেইল তো আর কেউ ঘাড়ে করে নেয় না, নেটওয়ার্ক দিয়ে যায়। তাই দেরি হয় না। সাথে সাথে চলে যায়।"

"কী তাজ্জবের ব্যাপার। কয়দিন পরে শুনব, ছবি চলে যাচ্ছে। কথা চলে যাচ্ছে। টেলিভিশনের মতো কথা বলছে।"

"কয়দিন পরে না মামা, সেটা এখনই করা যায়। আম্মুকে কিছুতেই পটাতে পারছি না একটা ছোট ভিডিও ক্যামেরা কিনে দিতে– তাহলে [illegible] যেতো!"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

[illegible] আমার বোন এই ঘরে চলে এসেছে। আমাদের দিকে তাকিয়ে হুংকার দিয়ে বলল, "কী বললি? আমাকে পটাতে পারছিস না? এখনও জিনিস কেনা বাকি আছে? একেবারে ফতুর হয়ে গেলাম, তারপরেও শখ যায় না। একজনকে নিয়ে পারি না এখন দুইজন জুটেছে? দুইজনে মিলে ষড়যন্ত্র হচ্ছে? শয়তানের বাক্স নিয়ে মামু-ভাগ্নের শয়তানি?"

আমি বললাম, "না-না আপা! তুমি কী বলছ এটা? ষড়যন্ত্র কেন হবে?"

"ষড়যন্ত্র নয়তো কী? মামু-ভাগ্নে দুইজনে মিলে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করছিস? ভাবলাম তুই অন্তত আমার ঝামেলাটুকু বুঝবি– আমার জন্য একটু মায়া হবে। আর শেষ পর্যন্ত তুইও বের হলি ঘরের শত্রু বিভীষণ?"

আপা খেপে গেলে তার মুখে একেবারে মেইল ট্রেন চলতে থাকে– আমি কিছুক্ষণেই কাবু হয়ে গেলাম। জরুরি কাজ আছে বলে এক-দুইবার উঠে যেতে চেষ্টা করেছি কিন্তু কোনো লাভ হলো না, আপা হুংকার দিয়ে বলেছে "তোর জরুরি কাজ আছে? আমাকে সেই কথা বিশ্বাস করতে বলিস? জীবনে তোকে দিয়ে কোনো কাজ হয়েছে? জরুরি কাজ ছেড়ে দে– সাধারণ একটা কাজও কখনো তোকে দিয়ে হয়েছে? বাজার করতে দিলে পর্যন্ত পচা মাছ কিনে নিয়ে আসিস। ডিমের হালি কতো জানিস না। দেশের প্রেসিডেন্টের নাম জানিস না–"

কাজেই আমাকে বসে থাকতে হলো। আপা টেবিলে খাবার দিতে দিতে বলল, "খেয়ে তুই বিল্টুকে নিয়ে বের হবি।"

আমি বিষম খেয়ে বললাম, "বি-বিল্টুকে নিয়ে বের হব? আমি?"

"হ্যাঁ। এই ছেলেকে এই শয়তানের বাক্স থেকে দূরে সরাতে হবে।"

আমি আমতা আমতা করে বললাম, "দূরে কোথায় সরাব?"

"সেটা আমি কি জানি? মামারা ভাগ্নেদের নিয়ে কতো আনন্দ করে, মজা করে সেসব করবি। চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবি। শিশুপার্কে নিয়ে যাবি।"

বিল্টু আঁতকে উঠে বলল, "চিড়িয়াখানা? শিশুপার্ক? সর্বনাশ!"

"সর্বনাশের কী হলো?"

"আমার স্কুলের বন্ধুরা যদি খবর পায় আমি চিড়িয়াখানা গেছি কিংবা শিশুপার্কে গেছি, তাহলে তারা আমার সাথে কথা বলবে ভেবেছ?"

"কেন কথা বলবে না?"

"মনে করবে আমি ন্যাদা ন্যাদা বাচ্চা!"

আপা বলল, "সেটা তোর আর তোর এই নিষ্কর্মা অপদার্থ মামার মাথাব্যথা। খেয়ে তোরা এই বাড়ি থেকে বের হবি। রাত নয়টার আগে আমি তোদের দেখতে চাই না।"

আমি দুর্বলভাবে আপত্তি করার চেষ্টা করলাম, আপা ভাতের চামচ দিয়ে ডাইনিং টেবিলে ঘটাং করে মেরে আমাকে থামিয়ে দিল।

কাজেই দুপুর বেলা আমি বিল্টুকে নিয়ে বের হলাম। বিল্টুর মুখ শুকনো, আমার মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু নিশ্চয়ই আমশি মেরে আছে। রাস্তার মোড় থেকে একটা রিকশা নিয়েছি। রিকশায় উঠে দুইজনের কেউই কথা বলছি না, অনেকক্ষণ পর বিল্টু একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সব দোষ তোমার মামা।"

"কেন, আমার কেন হবে?"

"তুমি যদি ই-মেইলের কথা না বলতে তাহলেই আজকের এই সর্বনাশটা হতো না।"

"সর্বনাশ? কোন জিনিসটাকে সর্বনাশ বলছিস?"

"এই যে তোমার সাথে আজকে সারাদিন থাকতে হবে।"

আমি এবারে বিল্টুর থেকেও একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "মামার সাথে থাকা তোর কাছে সর্বনাশ মনে হচ্ছে?"

"সর্বনাশ নয় তো কী? তুমিই বলো, তুমি কী ইন্টারেস্টিং জিনিস করতে পারো, বলো?"

"আমরা দুইজনে মিলে একটা সিনেমা দেখতে পারি। অনেকদিন থেকে আমি সিনেমা দেখি না। সিনেমা হলে বসে সিনেমা দেখার মজাই অন্যরকম।"

বিল্টু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "মামা, তুমি দুনিয়ার কোনো খবর রাখ না। তাই না?"

"কেন?"

"এই সপ্তাহে যে দুইটা সিনেমা রিলিজ হয়েছে তুমি তার নাম জান?"

"না, জানি না। কেন কী হয়েছে?"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

"একটার নাম হচ্ছে 'কিলিয়ে ভর্তা', অন্যটার নাম হচ্ছে 'টেংরিতে [illegible]"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "দেশটাতে হচ্ছেটা কী? সিনেমা হচ্ছে একটা শিল্প মাধ্যম। তার নাম কিলিয়ে ভর্তা?"

বিল্টু বলল, "মামা তুমি আসলে খুব ভালো আছ, দেশের কোনো কিছু জান না, খবরের কাগজ পড় না, মহানন্দে আছ।"

"তাহলে চল চিড়িয়াখানায় যাই।"

"না মামা। চিড়িয়াখানায় সব জন্তু জানোয়ার বাথরুম করে রেখেছে, দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না।"

"তাহলে শিশুপার্কে যাবি?"

বিল্টু চোখ কপালে তুলে বলল, "শিশুপার্কে? আমি? আমি কী শিশু না কী?"

"শিশু নয়তো কী? তোর কী এমন বয়স?"

বিল্টু মাথা নেড়ে বলল, "মামা তুমি জান না। শিশুপার্কে যায় বয়স্ক মানুষেরা, যাদের বুদ্ধি কম– শিশুদের সমান।"

"পার্কে যাবি?"

"গতকালকেই পার্কে দুইটা ছিনতাই হয়েছে।"

"তাহলে কোথায় যাবি?"

বিল্টু চোখ নাচিয়ে বলল, "এলিফেন্ট রোডে একটা কম্পিউটারের দোকান আছে–"

আমি শিউরে উঠে বললাম, "সর্বনাশ! আপা একেবারে খুন করে ফেলবে না?"

বিল্টু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তাহলে আর কী করব? রিকশাতেই বসে থাকি রাত নয়টা পর্যন্ত।"

আমি খুব দুশ্চিন্তার মাঝে পড়ে গেলাম, বারো বছরের একটা ছেলেকে নিয়ে সময় কাটানোর মতো কোনো বুদ্ধিই বের করতে পারব না? অনেক চিন্তা করে বললাম, "আমার একজন গায়ক বন্ধু আছে। যা সুন্দর ক্লাসিক্যাল গান গায়!"

বিল্টু শিউরে উঠল। আমি বললাম, "একজন আর্টিস্ট বন্ধু আছে তার বাসায় যাবি? মর্ডান আর্ট করে–"

বিল্টু মাথা নাড়ল, বলল, "মডার্ন আর্ট দেখলে ভয় করে।"

"পরিচিত একটা ভণ্ডপীরের বাসায় যাবি? যা ভংচং করে, দেখলে তোর তাক লেগে যাবে–"

বিল্টু এবারে খানিকটা কৌতূহল দেখালো কিন্তু ভিতরে গিয়ে পায়ে ধরে সালাম করতে হবে শুনে শেষ পর্যন্ত বেঁকে বসল। তখন আমার সায়রা সায়েন্টিস্টের কথা মনে পড়ল। বললাম, "একজন সায়েন্টিস্টের কাছে যাবি?"

"কোন সায়েন্টিস্ট?"

"ঐ যে আজকে ই-মেইল পাঠিয়ে দেখা করতে বলেছে।"

"কী আবিষ্কার করেছে?"

"অনেক কিছু। দেখলে হা হয়ে যাবি। সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হচ্ছে একটা ই–" হঠাৎ আমার মনে পড়ল আমি সায়রাকে কথা দিয়েছি তার বুদ্ধিমান ইঁদুরী জরিনির কথা কাউকে বলব না। কথা শেষ না করে থেমে গেলাম।

বিল্টু পেটে খোঁচা দিয়ে বলল, "কী? বলো।"

"বলা যাবে না।"

"কেন?"

"এটা সিক্রেট। আমি সায়রাকে কথা দিয়েছি কাউকে বলব না।"

এই প্রথমবার বিল্টুর চোখ কৌতূহলে জ্বল জ্বল করতে থাকে। খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "চল যাই সায়রা সায়েন্টিস্টের কাছে।"

আমি আর বিল্টু তখন সায়রা সায়েন্টিস্টের বাসার দিকে রওনা দিলাম। যদি রওনা না দিতাম তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসই হয়তো অন্যরকম করে লেখা হতো!

বাসায় গিয়ে কয়েকবার বেল টিপলাম কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেলো না। আবার টিপব না চলে যাব যখন বুঝতে পারছিলাম না, তখন হঠাৎ খুট করে দরজাটা খুলে গেলো। খুব অল্প একটু দরজা ফাঁক

করে সায়রা আমার দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলল, "ঢুকে পড়েন। তাড়াতাড়ি।"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

দরজার এক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে কেমন করে আস্ত একটা মানুষ ঢুকতে পারে আমি বুঝতে পারলাম না। আমি ইতিউতি করছিলাম কিন্তু তার মাঝে বিল্টু দরজা টেনে ফাঁক করে ভিতরে ঢুকে গেছে। সায়রা মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে এরকম ভান করে একেবারে হা হা করে উঠল এবং তার মাঝে আমিও ভিতরে ঢুকে গেলাম এবং সাথে সাথে সায়রা ঝপাং করে দরজা বন্ধ করে দিল। আমি অবাক হয়ে সায়রার দিকে তাকালাম, তাকে দেখাচ্ছে হলিউডের সিনেমার নায়িকাদের মতো। পিঠে যন্ত্রপাতি বোঝাই ব্যাকপেক, হাতে বিদঘুটে একটা অস্ত্র, কানে হেডফোন, মাথায় একটা টুপি এবং সেই টুপির ওপরে পাখার মতো একটা যন্ত্র আস্তে আস্তে ঘুরছে। সায়রার চুল উস্কোখুস্কো, চোখের নিচে কালি, গায়ে কালিঝুলি মাখা একটা ওভারঅল, শুধু মেয়ে বলে মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি নেই। আমি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে সায়রার দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, "কী হয়েছে?"

সায়রা সারাক্ষণই ইতিউতি তাকাচ্ছে, আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "সায়রা– কী হয়েছে?"

"সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

"সর্বনাশ?" আমি শুকনো গলায় বললাম, "আপনার ডাল রান্নার মেশিনে কিছু গোলমাল?"

সায়রা হাত নেড়ে বলল, "আরে না! ডাল রান্নার মেশিনের কথা ছেড়ে দেন।"

"তাহলে?"

আমার কথার উত্তর দেবার আগেই হঠাৎ করে মনে হলো সায়রা তার হেড ফোনে কিছু শুনতে পেলো, সাথে সাথে তার চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেলো। সে হঠাৎ ঘুরে ছুটে যায় হাতের বিদঘুটে অস্ত্রটার ট্রিগার টেনে ধরে এবং সেখান থেকে বজ্রপাতের মতো একটা বিদ্যুৎ ঝলক বের হয়ে আসে, ঘরের ভেতরে একটা পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে সাথে সাথে। বিল্টু চমকে উঠে আমার পিছনে লুকিয়ে আমার হাত খামচে ধরল ভয়ে। সায়রা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "এই ঘরেই আছে এখন। পরিষ্কার সিগনাল পাচ্ছি।"

আমি ভয়ে ভয়ে সায়রার দিকে তাকালাম, মনে হতে থাকে মেয়েটা হয়তো পাগল টাগল হয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে আপনার?"

"আমার কিছু হয়নি। জিজ্ঞেস করেন, পৃথিবীর কী হয়েছে!"

আমি শুকনো মুখে বললাম, "কী হয়েছে পৃথিবীর?"

"পৃথিবীর মহাবিপদ।"

"কেন?"

"জরিনি পালিয়ে গেছে?"

"তাই বলেন!" আমি বুক থেকে আটকে থাকা নিঃশ্বাসটা বের করে দিয়ে বললাম, "সেটা নিয়ে এতো ঘাবড়ানোর কী আছে?"

সায়রা হুংকার দিয়ে বলল, "কী বললেন আপনি? জরিনি পালিয়ে গেছে এবং সেটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই?"

বিল্টু আমার হাত টেনে বলল, "মামা জরিনি কে?"

"একটা ইঁদুর।"

মনে হলো সায়রা এই প্রথম বিল্টুকে দেখতে পেয়েছে, তার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, "এইটা কে?"

"আমার ভাগনে। নাম বিল্টু। খুব বুদ্ধিমান– আই কিউ বলতে পারেন জরিনির সমান।"

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, "মামা, ইঁদুর আবার বুদ্ধিমান হয় কেমন করে?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "সেটা বলা নিষেধ– তাই না সায়রা?"

সায়রা হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "আর নিষেধ! জরিনি পালিয়ে গিয়ে যে সর্বনাশ করেছে এখন আর গোপন করে কী হবে?"

"কেন সর্বনাশ কেন?"

"বুঝতে পারছেন না কেন?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "না।"

সায়রা হতাশার মতো একটা ভঙ্গি করে বলল, "কারণ জরিনি হচ্ছে একটা নেংটি ইঁদুরী–"

বিল্টু বাধা দিয়ে বলল, "ইঁদুরী?"

আমি বিল্টুকে থামিয়ে বললাম, "ব্যাকরণ বইয়ে– পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ পড়িস নি? কুকুর কুকুরী, পিশাচ পিশাচী– সেরকম ইঁদুর ইঁদুরী। জরিনি হচ্ছে মেয়ে ইঁদুর–"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software

"কিন্তু–" বিল্টু আপত্তি করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, সায়রা তাকে সেই সুযোগ দিল না। বলল, "নেংটি ইঁদুরের সাইজ মাত্র এতোটুকু– তাদের শরীরের হাড়, জয়েন্ট পর্যন্ত ফ্লেক্সিবল। এক ইঞ্চির চার ভাগের এক ভাগ একটা ফুটো দিয়ে এরা বের হয়ে যেতে পারে। এদের অসাধ্য কোনো কাজ নেই। প্রতি বছর এরা কতো কোটি টাকার ফসল নষ্ট করে জানেন?"

আমি মাথা নাড়লাম, "জানি না।"

"শুধু কী ফসল? জামা কাপড়, ঘর বাড়ি গাছপালা– কিছু বাকি নেই। এরা ইচ্ছে করলেই সারা পৃথিবী দখল করে নিতে পারে, নিচ্ছে না শুধু মানুষের কারণে। মানুষ নেংটি ইঁদুরকে কন্ট্রোলের মাঝে রেখেছে।"

সায়রা একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "এখন চিন্তা করুন জরিনির কথা– সে অসম্ভব বুদ্ধিমতী। আই কিউ একশ' কুড়ির কাছাকাছি। মানুষের সাথে সে পাল্লা দিতে পারে। পালিয়ে যাবার পর গত দুই দিন থেকে আমি তাকে পৃথিবীর সেরা যন্ত্রপাতি দিয়ে ধরার চেষ্টা করছি– ধরতে পারছি না। কপাল ভালো সে আমাদের কিছু করতে পারছে না, কারণ সে একা। কিন্তু–"

সায়রা হঠাৎ তার মুখ অসম্ভব গম্ভীর করে থেমে গেলো। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু?"

"কিন্তু সে একা থাকবে না।"

"কেন একা থাকবে না?"

"কারণ জরিনি ঘর সংসার করবে। তার বাচ্চা কাচ্চা হবে। বুদ্ধির জিনিসটা কোন ক্রমোজমে আছে জানি না, কিন্তু যেখানেই থাকুক তার বাচ্চা কাচ্চার মাঝে সেই বুদ্ধি ছড়িয়ে পড়বে। মানুষের হিসেবে জরিনি হচ্ছে কিশোরী বালিকা। অন্তত এক ডজন বাচ্চা হবে তার– সেখান থেকে ডজন ডজন নাতি– সেখান থেকে ডজন ডজন ডজন পুতি– বুঝতে পারছেন?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "বুঝেছি একজন বুদ্ধিমান ইঁদুরী থেকে বারোটা বাচ্চা, চব্বিশটা নাতি ছত্রিশটা পুতি–"

বিল্টু মাথা নাড়ল, বলল, "না মামা। তুমি মনে হয় জীবনে অঙ্কে পাস করো নাই। এক ডজন বাচ্চা হলে নাতি হবে একশ' চুয়াল্লিশ আর পুতি হবে দেড় হাজারের মতো। সংখ্যাটা যোগ নয়– গুণ হবে।"

সায়রা মাথা নাড়ল। বলল, "ঠিক বলেছ। সঠিক সংখ্যা হবে এক হাজার সাতশ' আটাশ। এই পুতিদের পুতি যখন হবে তাদের সংখ্যা হবে তিন মিলিয়ন। এখন চিন্তা করেন– ঢাকা শহরে তিন মিলিয়ন নেংটি ইঁদুর যাদের আই কিউ একশ' বিশ। চিন্তা করতে পারেন কী হবে?"

আমি আমতা আমতা করে বললাম, "ইয়ে মানে–"

"সকল খাবার তারা দখল করে নেবে। টেলিফোনের তার কেটে যোগাযোগ নষ্ট করে দেবে। ইলেকট্রিক কন্ট্রোল সিস্টেমের তার কেটে পাওয়ার সাপ্লাই নষ্ট করে দেবে। দেশে কোনো ইলেকট্রিসিটি থাকবে না। ফাইবার অপটিক লাইন কেটে নেটওয়ার্ক নষ্ট করে দেবে। যে কোনো যন্ত্রের ভিতরে ঢুকে টুক করে একটা তার কেটে যন্ত্রটা নষ্ট করে দেবে। কম্পিউটার অচল হয়ে যাবে। ট্রেন চলবে না– গাড়ি চলবে না। প্লেন ক্র্যাশ করে যাবে। দেশের মানুষ খেতে পাবে না। পাবলিক খেপে যাবে। দেশে আন্দোলন হবে– গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে–" সায়রা কথা বলতে বলতে শিউরে উঠল।

আমি মাথা চুলকে বললাম, "এটা থামানোর কোনো উপায় নাই?"

সায়রা মাথা নাড়ল, বলল, "একমাত্র উপায় হচ্ছে জরিনিকে শেষ করে দেয়া। আর যদি শেষ করা না যায় তাহলে কোনোভাবে তাকে এই ট্যাবলেটটা খাইয়ে দেওয়া।" সায়রা ছোট একটা ট্যাবলেট দেখালো, হলুদ রংয়ের লজেন্সের মতো।

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, "কী হয় এটা খেলে?"

"এটা একটা হরমোন ট্যাবলেট। এটা খেলে হরমোনের ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যাবে, আর কখনো বাচ্চা হবে না।"

বিল্টু বলল, "ইঁদুর এতো বড় ট্যাবলেট গিলতে পারবে? গলায় আটকে যাবে না?"

"এর মাঝে বাদামের গুঁড়ো, পনিরের টুকরো, মধু আর বিস্কুট মেশানো আছে। ইঁদুর খুব শখ করে খায়। কিন্তু জরিনিকে খাওয়ানোর জন্যে ধরতেই পারছি না। জরিনি বেটি মহা ধুরন্ধর।"

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, "এতো যদি বুদ্ধিমান তাহলে এই বাসা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে না কেন?"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

"চেষ্টা করছে– পারছে না। পুরো বাসাটা আমি সিল করে রেখেছি। জরিনির কানে একটা রিং লাগানো আছে। সেটা আসলে একটা মাইক্রোচিপ– সেখান থেকে বারো মেগাহার্টজ-এর একটা সিগনাল বের হয়। সেই সিগনালটা থেকে আমি বুঝতে পারি সে কোথায় আছে। যেমন এই মুহূর্তে সে সার্কিট ব্রেকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে–"

"কেন?"

সায়রার মুখ শক্ত হয়ে উঠল, বলল, "নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলব আছে। টেলিফোন লাইন কেটে দিয়েছে এখন নিশ্চয়ই ইলেকট্রিক লাইন কাটবে।"

"ইলেকট্রিক শক খেয়ে ছাতু হয়ে যাবে–"

"হবে না। বেটি মহা ধুরন্ধর। একটা পাওয়ার লাইনে ঝুলে ঝুলে কাটে, গ্রাউন্ড থেকে দূরে থাকে।"

কথা শেষ হতে না হতেই ঘটাং ঘটাং করে কয়েকটা শব্দ হলো এবং হঠাৎ করে ঘরবাড়ি একেবারে অন্ধকার হয়ে গেলো। সায়রা পা দাপিয়ে বলল, "হতভাগীর কাজ দেখেছেন? কতো বড় ধুরন্ধর– সরাসরি আমাকে চ্যালেঞ্জ করছে।"

আমি শুকনো গলায় বললাম, "এখন কী হবে?"

"ঐ বেটি চলে ডালে ডালে আমি চলি পাতায় পাতায়। এই রকম একটা কান্ড করতে পারে আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল সেই জন্য একটা জেনারেটর রেডি রেখেছি। দুই মিনিটের মাঝেই সেটা চালু হয়ে যাবে।"

আমরা আবছা অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে রইলাম, শুনতে পেলাম কুটুর কুটুর শব্দ করে কিছু একটা ঘরের দেয়ালের ভিতর দিয়ে ছুটোছুটি করছে। নিশ্চয়ই জরিনি– সায়রার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছে– কী হবে কে জানে? মিনিট দুয়েক-এর ভিতরে কোথায় জানি শব্দ করে জেনারেটর চালু হয়ে গেলো– সাথে সাথে ঘরে আলো জ্বলে ওঠে, নানা ধরনের যন্ত্রপাতি গুঞ্জন করতে শুরু করে। সায়েরা উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী জরিনি? ভেবেছিলি ইলেকট্রিক লাইন কেটে দিবি? এখন?"

আমরা শুনতে পেলাম কিচ কিচ শব্দ করে ইঁদুরটা কোথায় জানি ছুটে যাচ্ছে। বিল্টু জিজ্ঞেস করল, "সায়রা খালা। জরিনি পালালো কেমন করে?"

সায়রা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সেটা আরেক ইতিহাস। জরিনি অনেক কায়দা করে পালিয়েছে।"

"কী রকম কায়দা।"

"প্রথমে ভান করল সে অসুস্থ। আস্তে আস্তে হাঁটে। ফেবারিট হিন্দি গান শোনে না। ভালো করে খায় না। শরীর এলিয়ে শুয়ে থাকে। আমি সমস্ত কিছু টেস্ট করে দেখি– কিন্তু কোনো রোগের চিহ্ন পাই না। ভাবলাম ব্যাপারটা হয়তো সাইকোলজিক্যাল। মন ভালো করার জন্য একটা ছোট টেলিভিশন সেট লাগিয়ে দিলাম, সাথে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির ভিডিও। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। একদিন সকালে উঠে দেখি জরিনি মরে পড়ে আছে। চার পা ওপরে তুলে মুখ ভেংচি কেটে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মুখের কোণায় সাদা ফেনা– চোখ বন্ধ। আমি আর কী করব, গ্লাভস পরে মরা ইঁদুরটাকে বের করে এনেছি। ভাবলাম কেন মারা গেলো সেটা পোস্টমর্টেম করে দেখি। একটা ট্রের ওপরে রেখেছি। হঠাৎ করে সে লাফ দিয়ে উঠল তারপর ছুটে শেলফের ওপর উঠে গেলো–" সায়রা থেমে একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর কী হলো?"

"আমি পিছনে পিছনে ছুটে গেলাম। সেই বেটি ওপর থেকে ধাক্কা দিয়ে একটা জাইলিনের বোতল আমার উপর ফেলে দিল। এই দেখেন কপালে লেগে কেমন ফুলে উঠেছে–"

সায়রা তার মাথাটা আমাদের দিকে এগিয়ে দেয়। আমি এমনি দেখলাম বিল্টু একটু টিপে দেখল।

সায়রা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তারপর সে শেলফের একেবারে ওপরের র‍্যাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গি করে আমাকে ভেংচি কাটতে লাগল। কী বেয়াদবের মতো কাজ আপনি বিশ্বাস করবেন না।"

ইঁদুর কেমন করে বেয়াদব হয় আমি বুঝতে পারলাম না– কিন্তু এখন এটা জিজ্ঞেস করা মনে হয় ঠিক হবে না। সায়রা একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তারপর নিজের লেজটাকে একটা গিটারের মতো ধরে গান গাইতে লাগল–"

"গান গাইতে লাগল? ইঁদুর গান গাইতে পারে?"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

"তার ভাষায় গান :

কিচি কিচি কিচি কিচি ফু
কিচি কিচি কিচি কিচি
মিচি কিচি কু–"

"এইটা গান?"

"আমাকে বিরক্ত করার চেষ্টা আর কি! তারপর কী করল আপনি বিশ্বাস করবেন না।"

"কী করল?"

"তাকের ওপরে ইথাইল এলকোহলের একটা বোতল আছে, সেটা খুলে দুই ঢোক খেয়ে নেশা করে ফেলল।"

"নেশা?"

"হ্যাঁ। নেশা করে লাফায় ঝাপায় ধাক্কা দিয়ে এটা ফেলে দেয়– সেটা ফেলে দেয়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কাজ কী করল জানেন?"

বিল্টু আর আমি একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, "কী?"

"রান্নাঘর থেকে একটা ম্যাচ চুরি করে নিয়ে সেই সিলিংয়ের ওপরে বসেছে। ম্যাচের একটা কাঠি বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে জ্বালিয়ে নেয় তারপর সেটাকে মশালের মতো করে ধরে স্লোগান দেয়। মশাল মিছিলের মতো।"

"স্লোগান? কী স্লোগান–"

সায়রা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কিচমিচ করে কী একটা বলে– শুনে মনে হয় বলছে 'ধ্বংস হোক' 'ধ্বংস হোক'। সেটাই শেষ না– খানিকক্ষণ জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠিটা হাতে নিয়ে ঘুরাঘুরি করে ওপর থেকে ছুড়ে দেয়। একবার খবরের কাগজের ওপর পড়ে আগুন ধরে গেলো তাই দেখে জরিনির কী আনন্দ!"

"আগুন ধরে গেলো?" আমি আঁতকে উঠে বললাম, "সর্বনাশ!"

"সর্বনাশের আপনি দেখেছেন কী?" সায়রা মুখ কালো করে বলল, "যখন বুঝতে পারল আগুন দিয়ে সব জ্বালিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া যায় তখন সে ইচ্ছে করে আগুন ধরানোর চেষ্টা করতে লাগল। এলকোহলের একটা বোতল ধাক্কা দিয়ে ফেলে ভেঙে তার ওপর জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি ফেলে দিল। সারা ঘরে তখন দাউ দাউ আগুন। কী অবস্থা চিন্তা করতে পারবেন না। আরেকটু হলে ফায়ার ব্রিগেড ডাকতে হতো।"

"সর্বনাশ!" আমি বললাম, "কী ভয়ানক অবস্থা!"

"ভয়ানক বলে ভয়ানক।" সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "এর মাঝে সে [illegible] করে নিয়ে গেলো– সারারাত গাড়ি করে টহল দেয়। একটু হয়তো অন্যমনস্ক হয়েছি– পায়ের তলা দিয়ে সাঁই করে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। গাড়ির হর্ণে কান ঝালাপালা।"

সায়রার কথা শেষ হতেই মনে হয় আমাদের দেখানোর জন্য প্যাঁ প্যাঁ করে হর্ণ বাজিয়ে জরিনি তার গাড়ি চালিয়ে একটা টেবিলের তলা থেকে বের হয়ে অন্য পাশে ছুটে চলে গেলো। সায়রা তার অদ্ভুত অস্ত্র দিয়ে বজ্রপাতের মতো শব্দ করে বিদ্যুতের একটা ঝলক দিয়ে জরিনিকে কাবু করার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

বিল্টুর চোখ উত্তেজনায় চক চক করতে থাকে, হাতে কিল দিয়ে বলে, "কী সাংঘাতিক!"

"হ্যাঁ।" সায়রা বলল, "আসলেই সাংঘাতিক অবস্থা। কলিং বেলের কানেকশনটা খুলে রেখেছি, যেই ঘুমাতে যাই কানেকশন দিয়ে বসে থাকে। সারারাত বেলের শব্দে ঘুমাতে পারি নাই।" কথা বলতে বলতে হঠাৎ সায়রার মুখ পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেলো, চোখ বড় বড় হয়ে যায়, নাকের পাট ফুলে উঠে, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কিন্তু জরিনি টের পায়নি কতো ধানে কতো চাল। কতো গমে কতো আটা। কঠিন একটা যন্ত্র দাঁড়া করিয়েছি। জরিনি এখন কোথায় আছে আমি বলে দিতে পারি। কন্ট্রোল রুমে মনিটরে সবকিছু দেখা যায়। একা বলে পাজিটাকে শেষ করতে পারছিলাম না। এই জন্য আপনাকে খবর পাঠিয়েছিলাম।"

আমি ঢোক গিলে বললাম, "আমাকে কী করতে হবে?"

সায়রা আমার হাতে বিদঘুটে অস্ত্রটা দিয়ে মেঘ স্বরে বলল, "জরিনিকে ঘায়েল করতে হবে!"

"আমি?"

"হ্যাঁ। আমি কন্ট্রোল রুম থেকে আপনাকে বলে দেব কোনদিকে যেতে হবে, আপনি সেদিকে যাবেন, যখন বলব ট্রিগার টেনে ধরতে তখন ট্রিগার টেনে ধরবেন–"

"আ-আমি?"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

"আপনি না হলে কে করবে? পৃথিবীকে বাঁচানোর এই এতো বড় একটা দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।"

"কি কিন্তু–" আমি আমতা আমতা করে বললাম, "আমি কখনো খুন খারাপি করি নাই। ভায়োলেন্স দেখতে হবে বলে খবরের কাগজ পড়া ছেড়ে দিয়েছি।"

সায়রা বিরক্ত হয়ে বলল, "এর মাঝে আপনি ভায়োলেন্স কোথায় দেখলেন? একটা নেংটি ইঁদুরকে ঘায়েল করা ভায়োলেন্স হলো? যখন মশা মারেন তখন কী দুঃখে আপনার চোখ দিয়ে পানি পড়তে থাকে?"

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম তখন বিল্টু বলল, "সায়রা খালা আমাকে দেন– আমি পারব।"

সায়রা কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে বিল্টুর দিকে তাকিয়ে রইল এবং হঠাৎ করে তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। বিল্টুকে দেয়াই ঠিক। যতবার আমি ধাওয়া করি তখন জরিনি স্টোর রুমে একটা চিপার মাঝে ঢুকে পড়ে– সেখানে আপনি আপনার মোটা ভুঁড়ি নিয়ে ঢুকতে পারবেন না। যদি কষ্ট করে ঢুকেও যান মাঝখানে গিয়ে আটকে যাবেন– আপনাকে তখন টেনে বের করা যাবে না। জরিনি যদি বুঝতে পারে আপনি আটকে গেছেন তখন বড় বিপদ হতে পারে।"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "কী রকম বিপদ?"

"আপনার মাথার মাঝে কেরেসিন ঢেলে চুলে আগুন ধরিয়ে দিল। কিংবা ইলেকট্রিক তার এনে আপনার নাকের মাঝে ইলেকট্রিক শক দিল। কিংবা–"

আমি শিউরে ওঠে বিদঘুটে অস্ত্রটা তাড়াতাড়ি বিল্টুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, "থাক! থাক– আর বলতে হবে না। বিল্টুই যাক। সেই ভালো পারবে।"

বিল্টু মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। আমি এরকম অস্ত্র দিয়ে প্রতিদিন গোলাগুলি করি।"

সায়রা ভুরু কুঁচকে বলল, "কোথায় গোলাগুলি করো?"

"কম্পিউটার গেমে। আজকেই গুলি করে এই বিশাল একটা ডাইনোসর মেরেছি। টি-রেক্স।"

"ভেরি গুড।" সায়রা তার কান থেকে হেডফোন খুলে বিল্টুকে লাগিয়ে দিয়ে বলল, "এটা দিয়ে আমরা তোমার সাথে কথা বলতে পারব, তুমিও

আমাদের সাথে কথা বলতে পারবে।" মাথায় টুপিটা পরিয়ে দিয়ে বলল, "এটা একটা রাডারের মতো। এটা মাথায় থাকলে তুমি আগেই সিগন্যাল পেয়ে যাবে। জরিনি তোমাকে পিছন থেকে এটাক করতে পারবে না।"

বিল্টু অস্ত্র হাতে বলল, "আমাকে এটাক করা এতো সোজা না। আমার ধারে কাছে এলে একেবারে ছাতু করে দেব।"

"ভেরি গুড। এবার তাহলে তুমি যাও।"

বিল্টু একেবারে যুদ্ধ সাজে জরিনিকে ঘায়েল করতে এগিয়ে যেতে থাকে। সায়রা আমাকে বলল, "আপনি আসেন আমার সাথে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায়?"

"কন্ট্রোল রুমে।"

কন্ট্রোল রুমে বড় টেলিভিশনের স্ক্রিনের মতো একটা স্ক্রিন। তার আশপাশে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি নানা ধরনের শব্দ করছে। স্ক্রিনের মাঝামাঝি জায়গায় একটা লাল বিন্দু জ্বলছে এবং নিভছে। সায়রা বিন্দুটিতে আঙুল দিয়ে বলল, "এইটা হচ্ছে জরিনি। বসার ঘরে সোফার নিচে।" কাছাকাছি আরেকটা সবুজ বিন্দু জ্বলছে এবং নিভছে, সায়রা আঙুল দিয়ে সেটা ছুঁয়ে বলল, "আর এইটা হচ্ছে বিল্টু। আমাদের হিটম্যান।"

সায়রা কাছাকাছি রাখা একটা মাইক্রোফোন টেনে নিয়ে বলল, "হ্যালো বিল্টু– আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?"

স্পিকারে বিল্টুর কথা শুনতে পেলাম। "শুনতে পাচ্ছি। রজার।"

"তোমার সামনে দশ ফুট গিয়ে বামদিকে চার ফুট গেলে জরিনিকে পাবে।"

"টু ও ক্লক পজিশান?"

"রজার। টু ও ক্লক।"

আমি সায়রার দিকে তাকিয়ে বললাম, "টু ও ক্লক? মানে কী?"

"ঘরটাকে একটা ঘড়ির মতো চিন্তা করেন– ঠিক সামনে হচ্ছে বারোটা। দুইটা মানে হচ্ছে একটু সামনে একটু ডানে। বুঝেছেন?"

আমি কিছু বুঝলাম না কিন্তু সেটা বলতে লজ্জা লাগল, তাই জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললাম, "বুঝেছি। বুঝেছি।"

সায়রা মাইক্রোফোনে বলল, "বিল্টু। ডানদিকে সোফার নিচে লুকিয়ে আছে। ডাইভ দাও।"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

আমরা স্ক্রিনে দেখতে পেলাম সবুজ বিন্দুটা একটা ডাইভ দিল কিন্তু লাল বিন্দুটা তিন লাফে সরে স্ক্রিনের কোণায় চলে এলো। সায়রা বলল, "বিল্টু জরিনি এখন ফাইভ ও ক্লক পজিশনে।"

এইটার মানে কী আমি বুঝতে পারলাম না কিন্তু বিল্টু ঠিকই বুঝল, দেখলাম সবুজ বিন্দুটা আবার লাল বিন্দুটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু লাভ হলো না– জরিনি মহা ধুরন্ধর। ঠিক শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে সরে গেলো।

প্রায় আধঘন্টা এরকম লুকোচুরি খেলা হলো। আমি যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছি তখন হঠাৎ করে শুনতে পেলাম সায়রা দাঁতের ফাঁক দিয়ে আনন্দের একটা শব্দ করল। আমি বললাম, "কী হয়েছে?"

"এবারে বাছাধন আটকা পড়েছে।"

"আটকা পড়েছে?"

"হ্যাঁ– এখান থেকে পালানোর জায়গা নেই। যাকে বলে একেবারে অন্ধ গলি!" সায়রা মাইক্রোফোনে মুখ লাগিয়ে বলল, "বিল্টু! এইবারে আটকানো গিয়েছে।"

"রজার।"

"টুয়েলভ ও ক্লক। শার্প।"

"রজার।"

"উবু হয়ে ঢুকে যাও। ছয় ফুট দূর থেকে শুট করো।"

বিল্টু খানিকক্ষণ পর উত্তর করল, "ভিতরে অন্ধকার।"

"তোমার কোমরে সুইচ আছে। জ্বালিয়ে নাও।"

বিল্টু নিশ্চয়ই জ্বালিয়ে নিল, কারণ শুনতে পেলাম সে বলছে, "এবারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।"

"জরিনিকে দেখেছ?"

"দেখেছি।"

"শুট করো।"

আমরা কন্ট্রোল রুমে বসে একটা বজ্রপাতের মতো শব্দ শুনতে পেলাম। সায়রা নিঃশ্বাস আটকে রেখে বলল, "ঘায়েল হয়েছে? হয়েছে?"

"বুঝতে পারছি না।"

আমরা দেখতে পেলাম জরিনির লাল বিন্দুটি একই জায়গায় আছে– বিল্টুর সবুজ বিন্দু এগিয়ে যাচ্ছে। দুটি খুব কাছাকাছি চলে এলো– আবার বজ্রপাতের মতো শব্দ হলো। লাল বিন্দুটি কয়েকবার কেঁপে উঠল। সায়রা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এবারে একেবারে শেষ! বাঁচার কোনো উপায়ই নেই।"

আমরা দেখতে পেলাম লাল বিন্দু এবং সবুজ বিন্দু খুব কাছাকাছি। সায়রা মাইক্রোফোনে জিজ্ঞেস করল, "কী অবস্থা বিল্টু?"

বিল্টু কোনো উত্তর করল না। সায়রা আবার জিজ্ঞেস করল, "বিল্টু কী অবস্থা?"

বিল্টু এবারেও কোনো উত্তর করল না। শুধু দেখলাম লাল বিন্দু এবং সবুজ বিন্দু খুব কাছাকাছি। সায়রা একটু দুশ্চিন্তিত হয়ে ডাকল, "বিল্টু। তুমি ঠিক আছ তো?"

"জি ঠিক আছি।"

"মিশন কমপ্লিট?"

"কমপ্লিট। জরিনি ছ্যাড়াভেড়া হয়ে গেছে। কানের সাথে একটা রিং ছিল শুধু সেটা আছে। আর কিছু নাই।"

সায়রা জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে বলল, "হাইভোল্টেজে ভস্মীভূত হয়ে গেছে শুধু মাইক্রোওয়েভ ট্যাগটা আছে।"

বিল্টু জানতে চাইল, "ওটা কী নিয়ে আসব?"

"হ্যাঁ নিয়ে এসো।" সায়রা হঠাৎ একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

কিছুক্ষণের মাঝেই বিল্টু ফিরে এলো। যদিও বুঝতে পারছিলাম এরকম বুদ্ধিমান নেংটি ইঁদুর ছাড়া পেয়ে যাওয়া পৃথিবীর জন্য খুব বড় বিপদের ব্যাপার। তারপরেও এরকম চালাক চতুর ইঁদুরটা এভাবে মারা গেলো চিন্তা করে আমার খুব খারাপ লাগছিল। বিদঘুটে অস্ত্র হাতে বিল্টুকে দেখে মনে হতে লাগল একটা সন্ত্রাসী। এরকম বুদ্ধিমান একটা ইঁদুরকে মেরে ফেলা আমার কাছে মানুষ মেরে ফেলার মতো বড় অপরাধ মনে হতে লাগল। আমি সায়রার মুখের দিকে তাকালাম– এতো বড় একটা বিপদ থেকে সারা পৃথিবী রক্ষা পেয়েছে কিন্তু তার মুখে এখন আর সেরকম আনন্দ দেখা যাচ্ছে না। শুধু বিল্টুর চোখে মুখে ঝলমলে আনন্দ– ছোট বাচ্চারা মনে হয় একটু নিষ্ঠুর হয়।

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

পরিবেশটা কেমন জানি ভার ভার হয়ে রইল। জরিনির কানে যে রিংটা [illegible] সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "জরিনি [illegible] দিয়ে আমাকে।" আমি দেখলাম সায়রার চোখ ছল ছল করছে।

আমি আর বিল্টু যখন সায়রার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসছি তখন হঠাৎ করে বিল্টু বলল, "সায়রা খালা–"

"উঁ।"

"আপনি হলুদ রংয়ের একটা ট্যাবলেট দেখিয়েছেন না– যেটা খেলে ইঁদুরের বাচ্চা কাচ্চা হয় না?"

"হ্যাঁ। কী হয়েছে সেটার?"

"আমাকে একটা ট্যাবলেট দেবেন?"

"কেন কী করবে?"

"আমাদের বাসায় কয়দিন থেকে খুব ইঁদুরের উৎপাত। এটা ফেলে রাখব– ইঁদুর খেয়ে ফ্যামিলি প্ল্যানিং করবে। আর ইঁদুরের বাচ্চা হবে না।"

সায়রা একটা নিঃশ্বাস ফেলে টেবিলের ওপর থেকে একটা কৌটা বের করে একটা ট্যাবলেট বের করে বিল্টুর হাতে দিয়ে বলল, "নাও। জরিনির জন্য তৈরি করেছিলাম– সেই যখন নেই এই ট্যাবলেট দিয়ে আমি আর কী করব?" সায়রা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল– জরিনির শোকে বেচারি হঠাৎ করে খুব কাতর হয়ে গেছে।

আমি আর বিল্টু রিকশা করে যাচ্ছি। রাত সাড়ে আটটার মতো বাজে– নয়টার ভিতরে বাসায় পৌঁছে যাব। রিকশাটা টুকটুক করে যাচ্ছে, বেশ সুন্দর একটা ঝিরঝিরে বাতাস দিচ্ছে। বিল্টু অনেকক্ষণ কোনো কথা বলছে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা বিল্টু, তুই যে এতোটুকুন একটা ইঁদুরের বাচ্চাকে এভাবে গুলি করে মারলি তোর খারাপ লাগল না?"

"কেন? খারাপ লাগবে কেন?"

"ইঁদুর হলেও তো একটা প্রাণী। বিশেষ করে এরকম বুদ্ধিমান একটা প্রাণী। আই কিউ মানুষের সমান।"

বিল্টু মাথা নাড়ল, বলল, "না, মামা। আমার একটুও খারাপ লাগছে না।"

"একটুও না?"

"না। একটুও না। বরং খুব ভালো লাগছে।"

আমি একটু [illegible] বিল্টুর দিকে তাকালাম, এইটুকুন ছেলে এরকম নিষ্ঠুর? জিজ্ঞেস করলাম, "তোর ভালো লাগছে?"

"হ্যাঁ। কেন জান?"

"কেন?"

"এই দেখো।" বলে বিল্টু তার পকেটে হাত দেয় এবং সাবধানে হাতটা বের করে আনে, সেখানে জরিনি পিছনের দুই পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসে আছে। সেটি চুকচুক করে একবার বিল্টুর দিকে আরেকবার আমার দিকে তাকালো। বিল্টু জরিনির মাথায় আঙুল দিয়ে আদর করে বলল, "তোমার কোনো ভয় নেই জরিনি। আর কেউ তোমাকে মারতে পারবে না।"

জরিনি সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকালো। আমি অবাক হয়ে একটা চিৎকার দিয়ে রিকশা থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম। অনেক কষ্ট করে নিজেকে সামলে বললাম, "জ-জ-জরিনি মরেনি?"

"উহুঁ।" বিল্টু দাঁত বের করে হেসে বলল, "কথা বলতে পারলে জরিনি বলতো– আমি মরিনি!"

"কিন্তু, কিন্তু–" আমি আমতা আমতা করে বললাম, "আমরা স্পষ্ট শুনতে পেলাম তুই গুলি করেছিস!"

"ফাঁকা গুলি করেছি ওপরের দিকে। তখনই জরিনি বুঝতে পারল আমি বাঁচাতে এসেছি। চোখ টিপে হাত দিয়ে ডাকতেই সুড়ুৎ করে চলে এলো। কান থেকে রিংটা খুলে তাকে পকেটে রেখে দিয়েছি। একটুও শব্দ করেনি!"

"এখন যদি তোর হাত থেকে পালিয়ে যায়?"

"কেন পালিয়ে যাবে? আমি আর জরিনি এখন প্রাণের বন্ধু! তাই না জরিনি?"

জরিনি ঠিক মানুষের মতো মাথা নাড়ল। বিল্টু বলল, "তাছাড়া আমি সায়রা খালার কাছ থেকে হলুদ ট্যাবলেট নিয়ে এসেছি। সেটা এখন খাইয়ে দেব।"

"কীভাবে খাওয়াবি?"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

"এই যে এইভাবে।" বলে বিল্টু অন্য পকেট থেকে হলুদ ট্যাবলেটটা বের করে জরিনিকে জিজ্ঞেস করলো, "খিদে পেয়েছে?"

জরিনি মাথা নাড়ল। বিল্টু তার হাতে ট্যাবলেটটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, "নাও খাও।"

জরিনি কুট কুট করে খেতে থাকে, আমি রুদ্ধশ্বাসে সেদিকে তাকিয়ে থাকি, সমস্ত পৃথিবী একটা মহাপ্রলয় থেকে উদ্ধার পাওয়া নির্ভর করছে এই ট্যাবলেটটা খেয়ে শেষ করার ওপরে।

সপ্তাহ খানেক পরে বোনের বাসায় বেড়াতে গিয়েছি– বোন আমাকে দেখে বলল, "বুঝলি ইকবাল। তোকে সব সময় আমি অপদার্থ জেনে এসেছি। কিন্তু তুই দেখি ম্যাজিক করে দিলি।"

"কী ম্যাজিক?"

"বিল্টুর মাথা থেকে কম্পিউটারের ভূত দূর করে দিয়েছিস। সেই যে সেদিন কয়েক ঘন্টার জন্য নিয়ে গিয়েছিলি কীভাবে বুঝিয়েছিস কে জানে। ম্যাজিকের মতো কাজ হয়েছে।"

"তাই না কী?"

"হ্যাঁ। এখন দেখি দিন রাত ঘরে দরজা বন্ধ করে হাতের কাজ করে।"

"হাতের কাজ?"

"হ্যাঁ। ছোট ছোট চেয়ার টেবিল তৈরি করেছে। একটা ছোট বিছানাও। সেদিন দেখি একটা খেলনা গাড়ির মাঝে কীভাবে কীভাবে ব্যাটারী দিয়ে একটা ইঞ্জিন বসাবে। দিন রাত দেখি ব্যস্ত।"

"তাই না কী?"

"হ্যাঁ। লাইব্রেরি থেকে বই এনে বেশ পড়াশোনাও করে।"

"কীসের ওপর বই?"

"জন্তু জানোয়ারের ওপর বই। শুরু করেছে ইঁদুরের বই দিয়ে।"

আমি কেশে গলা পরিষ্কার করে বললাম, "ও আচ্ছা!"

"আর কী একটা হয়েছে– দুই চোখে বিড়াল দেখতে পারে না। বাসায় কোথা থেকে একটা হুলো বেড়াল এসেছিল, নিজে সেটাকে ধরে বস্তায় ভরে বুড়ীগঙ্গার ঐ পাড়ে ফেলে এসেছে।"

আমি খুব অবাক হবার ভান করলাম। আপা অবশ্যি হঠাৎ মুখ কালো করে বললেন, "তবে–"

"তবে কী?"

"একটা দোষ হয়েছে।"

"দোষ?"

"হ্যাঁ।"

"কী দোষ?"

"সেদিন দেখি সিলিং থেকে একটা জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি নিচে পড়ল।"

"জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি?"

"হ্যাঁ। একেবারে অবিশ্বাস ব্যাপার। আর কোনো মানুষ নেই জন নেই মাঝ রাতে হঠাৎ করে কলিংবেল বাজতে থাকে।"

"কী আশ্চর্য!"

বোন মুখ গম্ভীর করে বললেন, "ভালো একটা বাসা পেলে জানাবি– এই দোষে পাওয়া বাসায় থাকতে চাই না।"

"ঠিক আছে আপা, জানাব।"

বোনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিল্টুর সাথে দেখা করতে গেলাম। অন্যবারের মতো আমাকে দেখে মুখ কালো করে ফেলল না, বরং তার মুখ পুরোপুরি একশ' ওয়াট না হলেও মোটামুটি চল্লিশ ওয়াট বাল্বের মতো জ্বলে উঠল। আমি গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "জরিনির কী খবর?"

বিল্টু ফিস ফিস করে বলল, "ভালো। তবে–"

"তবে কী?"

"খুব মেজাজ গরম। পান থেকে চুন খসলে রক্ষা নাই। সেদিন একটু বকেছি তখন ম্যাচ নিয়ে সিলিংয়ে উঠে গেলো! তারপর–"

"জানি। আপা বলেছে।"

"তার সাথে না খেললে সারারাত কলিংবেল বাজায়।"

"কী খেলিস?"

"দাবা। ওপেনিং মুভ যাচ্ছেতাই–"

"ও।"

"খুব ভয়ে ভয়ে আছি মামা, কোন দিন না আম্মুর কাছে ধরা পড়ে যাই। আম্মু কম্পিউটারকে যত ঘেন্না করে– ইঁদুরকে তার চেয়ে একশ' গুণ বেশি ঘেন্না করে।"

"আপাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। নেংটি ইঁদুরকে ভালোবাসার কারণ আছে?"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

বিল্টু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "শ-স-স-স, জরিনি শুনলে খবর আছে।"

শেষ খবর অনুযায়ী সায়রা সায়েন্টিস্টের ডাল রাঁধার যন্ত্রের কাজ প্রায় শেষ। জরিনি আসলে মারা যায়নি শুনে সে খুব খুশি হয়েছে। বিল্টুকে সে রাখতে দিয়েছে তবে কঠিন একটা শর্ত আছে– কোথা থেকে পেয়েছে কাউকে বলতে পারবে না!

বিল্টুর তাতে সমস্যা নেই– সে যে একটা নেংটি ইঁদুর পেয়েছে সেই কথাটিই এখনো কেউ জানে না। আমি ছাড়া।

shaibalrony@yahoo.com

মোল্লা গজনফর আলী

আমি কলিংবেলে চাপ দিয়ে বিল্টুকে বললাম, "বুঝলি বিল্টু, যদি দেখা যায় সায়রা বাসায় নাই, কিংবা বাসায় আছে কিন্তু দরজা খুলছে না কিংবা দরজা খুলছে কিন্তু ভেতরে আসতে বলছে না কিংবা ভেতরে আসতে বলছে কিন্তু খেতে বলছে না তাহলে কিন্তু অবাক হবি না।"

বিল্টু ভুরু কুঁচকে বলল, "কেন মামা?"

"কারণ এইটাই সায়েন্টিস্টদের ধরন। সব সময় কঠিন কঠিন জিনিস নিয়ে চিন্তাভাবনা করে তো, তাই সাধারণ জিনিসগুলি তারা ভুলে যায়।"

"এইটা কি সাধারণ জিনিস হলো? আমাদের খেতে দাওয়াত দিয়েছে– এখন ভুলে গেলে চলবে?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "সাধারণ মানুষের বেলায় চলবে না– কিন্তু সায়েন্টিস্টদের বেলায় কিছু বলা যায় না। সবকিছু ভুলে যাওয়া হচ্ছে তাদের কাজ।"

"তুমি কেমন করে জান?"

"সিনেমায় দেখেছি।"

আমার কথা বিল্টু পুরোপুরি বিশ্বাস করল বলে মনে হলো না, সে নিজেই এবারে কলিংবেল টিপে ধরল, যতক্ষণ টিপে ধরে রাখা ভদ্রতা তার থেকে অনেক বেশিক্ষণ। এবারে কাজ হলো, কিছুক্ষণের মাঝেই খুট করে দরজা খুলে গেলো এবং সায়রা মাথা বের করে বলল, "ও! আপনারা চলে এসেছেন?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, মানে ইয়ে, আমরা একটু আগেই চলে এলাম।"

"ভালোই করেছেন। আপনারাও তাহলে দেখতে পারবেন।"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, "কী দেখতে পারব?"

"আমার রান্না করার মেশিন।" সায়রা গম্ভীর হয়ে বলল, "এখন পর্যন্ত তিনটা ইউনিট রেডি হয়েছে। ভাত, ডাল আর ডিমভাজি।"

বিল্টুর চক্ষুলজ্জা স্বাভাবিক মানুষ থেকে অনেক কম। সে জিজ্ঞেস করল, "তার মানে আমরা শুধু ভাত, ডাল আর ডিমভাজি খাব?"

আমি ধমক দিয়ে বললাম, "মেশিন যেটা রাঁধে সেটাই তো খাবি, গাধা কোথাকার!"

বিল্টু মুখটা প্যাঁচার মতো করে বলল, "বিরিয়ানি রাঁধতে পারে এরকম একটা মেশিন তৈরি করলেন না কেন সায়রা খালা?"

সায়রা কিছু বলার আগেই আমি বললাম, "বিরিয়ানিতে কত কোলেস্টেরল জানিস না বোকা? খেয়ে মারা যাবি নাকি?"

সায়রা বলল, "আস্তে আস্তে হবে। রান্নার বেসিক অপারেশন হচ্ছে তিনটা– সেদ্ধ, ভাজা এবং পোড়া। কাজেই যে মেশিন সেদ্ধ করতে পারে, ভাজতে পারে এবং পোড়াতে পারে, সেটা দিয়ে পৃথিবীর সবকিছু রান্না করা যাবে। মেশিনের সামনে একটা ডায়াল থাকবে, সেখানে শুধু টিপে দেবে– ব্যস, অটোমেটিক রান্না হয়ে যাবে।"

"সবকিছু রান্না হবে?"

সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "অবশ্যই সবকিছু রান্না হবে।"

বিল্টু মুখ গম্ভীর করে বলল, "আপনার এমন একটা মেশিন তৈরি করা উচিত যেটা সবজি রাঁধবে না, দুধ গরম করবে না। তাহলে দেখবেন সেটা কতো বিক্রি হবে! বাচ্চারা পাগলের মতো কিনবে।"

আমি বিল্টুকে ধমক দিয়ে বললাম, "থাক– তোকে আর উপদেশ দিতে হবে না।"

সায়রা একটু হাসল। তাকে আমি হাসতে দেখেছি খুব কম। আমি আবিষ্কার করলাম সে হাসলে তাকে বেশ সুন্দর দেখায়।

আমি বললাম, "চলেন আপনার যন্ত্রটা দেখি।"

"চলেন।"

ঘরের মাঝামাঝি প্রায় ছাদ-সমান উঁচু বিশাল একটা যন্ত্র। নানা রকমের বাতি জ্বলছে এবং নিভছে। উপরে বেশ খানিকটা অংশ স্বচ্ছ, সেখানে অনেকগুলো খোপ। খোপগুলোর একেকটাতে একেকটা জিনিস।

কোনোটাতে চাল, কোনোটাতে ডাল, কোনোটাতে ডিম। এছাড়াও আছে পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ, শুকনোমরিচ, লবণ এবং তেল। সামনে একটা ডায়াল, সেখানে লেখা– ভাত, ডাল এবং ডিমভাজা। সায়রা জিজ্ঞেস করল, "আগে কোনটা রাঁধব?"

আমি কিছু বলার আগেই বিল্টু বলল, "ডিমভাজা।"

"ঠিক আছে।" সায়রা ডায়ালটা দেখিয়ে বলল, "এখানে চাপ দাও।"

বিল্টু ডায়ালটা চেপে ধরল– সাথে সাথে মনে হলো মেশিনের ভেতর ধুন্ধুমার কাজ শুরু হয়ে গেলো। ডিমের খোপ থেকে ডিমগুলো গড়িয়ে আসতে থাকে বিশাল একটা পাত্রে। সেগুলো টপটপ করে পড়ে ভেঙে যেতে থাকে। ছাকনির মতো একটা জিনিস ডিমের খোসাগুলোকে তুলে নেয় এবং বিশাল একটা ঘুটনির মতো জিনিস সেটাকে ঘুটতে শুরু করে। অন্য পাশ থেকে পোঁ পোঁ করে একটা শব্দ হয় এবং প্রায় কয়েক কেজি পেঁয়াজ গড়িয়ে আসতে থাকে, মাঝামাঝি আসতেই ধারালো একটা তরবারির মতো জিনিস পেঁয়াজটাকে কুপিয়ে ফালাফালা করে দেয়। সেটা শেষ হবার সাথে সাথে কাঁচামরিচ নেমে আসে এবং ছোট একটা চাকু সেটাকে কুচি কুচি করে ফেলে। ওপরে কী একটা খুলে যায় এবং ঝুরঝুর করে খানিকটা লবণ এসে পড়ল। হঠাৎ সাইরেনের মতো একটা শব্দ হতে থাকল, দেখলাম বিশাল একটা কড়াইয়ের ভেতর গলগল করে প্রায় দুই লিটার তেল এসে পড়ল। বিস্ফোরণের মতো একটা শব্দ হলো এবং কড়াইয়ের নিচে হঠাৎ ফার্নেসের মতো আগুনের শিখা বের হয়ে এলো। দেখতে দেখতে তেল ফুটতে থাকে এবং বিদঘুটে একটা শব্দ করে ঘুটে রাখা ডিম সেখানে ফেলে দেয়া হলো। প্রচণ্ড শব্দ করে ডিমভাজা হতে থাকে। সারা ঘর ভাজা ডিমের গন্ধে ভরে যায়। সায়রা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল, এবারে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "সাবধান! সবাই দূরে সরে যান।"

বিল্টু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন সায়রা খালা?"

"ডিমভাজাটা এখন প্লেটে ছুঁড়ে দেবার চেষ্টা করবে, মাঝে মাঝে মিস করে, তখন বিপদ হতে পারে।"

ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর, কারণ উপরে অ্যাম্বুলেন্সের মতো লালবাতি জ্বলতে শুরু করে। মাঝামাঝি একটা জায়গায় কাউন্ট-ডাউন শুরু হয়ে যায়, দশ নয় আট সাত...।

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

আমরা দূরে সরে গিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের মতো শব্দ হলো এবং মনে হলো বিছানার তোশকের মতো [illegible] একটা জিনিস আকাশের দিকে ছুটে গেলো। চাকার মতো [illegible] গামলার মাঝে এসে পড়ল। সায়রা হাততালি দিয়ে বলল, "পারফেক্ট ল্যান্ডিং।"

আমি আর বিল্টু সায়রার পিছু পিছু ডিমভাজাটা দেখতে গেলাম। এর আগে আমি কিংবা মনে হয় পৃথিবীর আর কেউ এতো বড় ডিমভাজা দেখেনি। আড়াআড়িভাবে এটা পাঁচ ফিট থেকে এক ইঞ্চি কম হবে না। আমি আমতা-আমতা করে বললাম, "এতো বড় ডিমভাজা?"

সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "আস্তে আস্তে মেশিনটা ছোট করতে হবে। প্রথমে শুরু করার জন্যে সব সময় একটা বড় মডেল তৈরি করতে হয়।"

বিল্টু ভয়ে ভয়ে বলল, "আমাদের পুরোটা খেতে হবে?"

সায়রা হেসে বলল, "না না, পুরোটা খেতে হবে না। যেটুকু ইচ্ছে হবে সেটুকু খাবে।"

বিল্টু খুব সাবধানে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এই ডিমভাজাটা কমপক্ষে চল্লিশজন খেতে পারবে।"

সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। এটা তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন, সবকিছুই বেশি বেশি করে হয়।"

সায়রা যে মিথ্যে বলেনি একটু পরেই তার প্রমাণ পেলাম– কারণ রান্না করার পর ভাত এবং ডাল ডাইনিং রুমে বড় বড় বালতি করে আনতে হলো। আমরা খাবার টেবিলে খেতে বসেছি– চামচ দিয়ে মেঝেতে রাখা বালতি থেকে ভাত-ডাল তুলে নিতে হলো। ডিমভাজা চাকু দিয়ে কেটে আলাদা করতে হলো।

আমরা খেতে শুরু করা মাত্রই সায়রা চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল, "কেমন হয়েছে?"

মিথ্যে কথা বললে পাপ হয় এবং সেই পাপের কারণে নাকি দোজখের আগুনে শরীরের নানা অংশ পুড়তে থাকবে, কিন্তু আমার ধারণা– কারো মনে কষ্ট না দেবার জন্যে মিথ্যে কথা বললে পাপ হয় না। আমি খুব তৃপ্তি করে খাচ্ছি এরকম ভান করে বললাম, "খুব ভালো হয়েছে। একেবারে ফার্স্ট ক্লাস?"

বিল্টু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ফার্স্ট ক্লাস? কী বলছ মামা! খাবার মুখে দেয়া যায় না। কোনো স্বাদ নাই।"

বিল্টুকে থামানোর জন্যে আমি টেবিলের তলা দিয়ে তার পায়ে লাথি [illegible] লাগল সায়রার পায়ে এবং সে মৃদু আর্তনাদ করে উঠল। বিল্টু অবশ্যি ভ্রূক্ষেপ করল না, বলল, "সায়রা খালা, আপনার মেশিনের রান্নার স্বাদ যদি এরকম হয় তাহলে তার একটাও বিক্রি করতে পারবেন না।"

সায়রা খানিকক্ষণ হতচকিত হয়ে বিল্টুর দিকে তাকিয়ে থেকে ইতস্তত করে বলল, "আমি তো আসলে ঠিক বিক্রি করার জন্যে এটা আবিষ্কার করি নাই। এটা আবিষ্কার করেছি নারী জাতিকে রান্নাঘর থেকে মুক্ত করার জন্যে।"

কীভাবে কথাবার্তা বলতে হয় সেটা যে বিল্টুকে শেখানো হয়নি আমি এবারে সেটা আবিষ্কার করলাম, সে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "এটা দিয়ে নারী জাতির মুক্তি হবে না সায়রা খালা, বরং উল্টোটা হতে পারে।"

"উল্টোটা?"

"হ্যাঁ। যে এটা দিয়ে রান্না করবে তাকে ধরে সবাই পিটুনি দিতে পারে। গণপিটুনি।"

আমি এবারে ভাবনাচিন্তা করে বিল্টুর পা কোনদিকে নিশ্চিত হয়ে একটা লাথি কসালাম। বিল্টু কঁকিয়ে উঠে বলল, "উহ্! মামা– লাথি মারলে কেন?"

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "লাথি মারিনি। পা লেগে গেছে!"

"খাবার টেবিলে বসে তুমি কি পা দিয়ে ফুটবল খেল? এতো জোরে পা লেগে যায়!"

সায়রার চোখ এড়িয়ে আমি বিল্টুর চোখে চোখ রেখে একটা সিগন্যাল দেয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। বিল্টু বলতেই লাগল, "সায়রা খালা, তোমার এই মেশিন বিক্রি করলে লাভ থেকে ক্ষতি হবে বেশি।"

"কেন?"

"কারণ কেউ এর রান্না খাবে না। যদি কাউকে খাওয়াতে চাও তোমাকে টাকা-পয়সা দিয়ে খাওয়াতে হবে। এক প্লেট ভাত দশ টাকা। এক বাটি ডাল বিশ টাকা। ডিমভাজি পঞ্চাশ টাকা। কমপক্ষে সত্তর টাকা।"

আমি আর না পেরে বিল্টুকে ধমক দিয়ে বললাম, "কী আজেবাজে কথা বলছিস বিল্টু? সবকিছু নিয়ে ঠাট্টা?"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

বিল্টু [illegible] বলল, "না মামা, আমি একটুও ঠাট্টা করছি না। সত্যি [illegible]"

"আমি খাচ্ছি না?" আমি জোর করে মুখে কয়েক লোকমা ভাত ঠেসে দিয়ে বললাম, "আমার তো খেতে বেশ লাগছে!"

"তোমার কথা আলাদা মামা। তুমি নিশ্চয়ই পাগল। আম্মা সব সময় বলে তোমার জন্মের সময় ব্রেনে নাকি অক্সিজেন সাপ্লাই কম হয়েছিল, সে জন্যে তুমি কোনো কিছু বোঝ না।"

সায়রাকে বেশ চিন্তিত দেখালো। সে একটা বড় কাগজ দেখতে দেখতে বলল, "আমার মেশিনের রিপোর্ট তো ঠিকই দিয়েছে। এই দেখেন– ডিমভাজার সালফার কন্টেন্ট লিমিটের মাঝে। ডালের পিএইচ পারফেক্ট। ভাতের সারফেস টেক্সচার অপটিমাম।"

আমি উৎসাহ দেবার জন্যে বললাম, "মেশিন যেহেতু বলেছে ঠিক, এটা অবশ্যি ঠিক। বিল্টু সেদিনের ছেলে, সে কী বোঝে? তার কোনো কথা শুনবেন না।"

বিল্টু মুখ বাঁকিয়ে বলল, "সব ঠিক থাকতে পারে কিন্তু কোনো স্বাদ নাই।"

সায়রা হঠাৎ করে অন্যমনস্ক হয়ে গেলো, কিছুক্ষণ কী একটা ভেবে হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা জাফর ইকবাল সাহেব, স্বাদ মানে কী?"

হঠাৎ করে এরকম একটা জটিল প্রশ্ন শুনে আমি একেবারে ঘাবড়ে গেলাম। আমতা আমতা করে বললাম, "স্বাদ মানে হচ্ছে– যাকে বলে– আমরা যখন খাই তখন মানে– ইয়ে– যাকে বলে–"

আরো কিছুক্ষণ হয়তো এরকম আমতা আমতা করতাম কিন্তু সায়রা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "এটা হচ্ছে একটা অনুভূতি। আমরা যখন কিছু খাই তখন জিব তার একটা অনুভূতি পায়, নাক একটা গন্ধ পায়। দাঁত-মাড়ি এক ধরনের স্পর্শ অনুভব করে, তার সবগুলো নার্ভ দিয়ে আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছায়। সেখানে নিউরনে এক ধরনের সিনাপ্স কানেকশান হতে থাকে। মস্তিষ্কের সেই অনুভূতি থেকে আমরা বলি স্বাদটি ভালো কিংবা স্বাদটি খারাপ।"

সায়রার চোখ দুটো এক ধরনের উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করতে থাকে। আমাদের দুইজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তার মানে বুঝতে পারছেন?"

[illegible] নেড়ে বললাম, "না।"

"তার মানে একটা জিনিসের স্বাদ ভালো করার জন্যে কষ্ট করে সেটাকে ভালো করে রান্না করার দরকার নেই। আমরা যদি খুঁজে বের করতে পারি ব্রেনের কোন জায়গাটাতে আমরা খাবারের স্বাদ অনুভব করি সেখানে যদি আমরা এক ধরনের স্টিমুলেশন দিই তাহলে আমরা যেটা খাব সেটাকেই মনে হবে সুস্বাদু।"

বিল্টু চোখ বড় বড় করে বলল, "সত্যি?"

"একশ' বার সত্যি। তার মানে আমি যদি সেরকম একটা মেশিন তৈরি করতে পারি যেটা দিয়ে ব্রেনের নির্দিষ্ট জায়গায় স্টিমুলেশান দেয়া যায় তাহলে খবরের কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলে মনে হবে কোরমা পোলাও খাচ্ছি!"

আমি চমকে উঠে বললাম, "খবরের কাগজ?"

"হ্যাঁ। স্পঞ্জের স্যান্ডেল খেলে মনে হবে সন্দেশ খাচ্ছেন। কেরোসিন খেলে মনে হবে অরেঞ্জ জুস খাচ্ছেন। পৃথিবীতে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়া যাবে!"

বিল্টু ঢোক গিলে বলল, "কিন্তু সেটা মাথার ভেতরে বসানোর জন্যে আপনাকে ব্রেনের অপারেশন করতে হবে! আপনাকে আগে ব্রেনের সার্জারি শিখতে হবে। যদি শিখেও যান তারপরও আমার মনে হয়–"

সায়রা ভুরু কুঁচকে বলল, "কী মনে হয়?"

"খবরের কাগজ, স্পঞ্জের স্যান্ডেল আর কেরোসিন খাবার জন্য কেউ ব্রেনের সার্জারি করতে রাজি হবে না।"

"রাজি হবে না?"

"উঁহু।"

সায়রাকে হঠাৎ খুব চিন্তিত মনে হলো।

আমাদের খাওয়ার দাওয়াতটা মোটামুটিভাবে মাঠে মারা গেলো বলা যায়। ব্রেনের ভেতরে স্টিমুলেশান দেয়ার কথাটা সায়রার মাথায় আসার পর থেকে সে অন্যমনস্ক হয়ে রইল, ভুরু কুঁচকে চিন্তা করতে লাগল এবং মাঝে মাঝে মাথা নাড়তে লাগল। আমরা তাকে আর ঘাঁটালাম না, বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

বিল্টু আর আমি একটা ফাস্টফুডের দোকান থেকে হ্যামবার্গার খেয়ে সে [illegible]।

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

বিজ্ঞানের ব্যাপারে আমি আগে যেরকম হাবাগোবা ছিলাম এখন আর সেরকম বলা যাবে না। সায়রা সায়েন্টিস্টের সাথে পরিচয় হওয়ার জন্যেই হোক আর বিল্টুর জ্বালাতনের কারণেই হোক আমি মোটামুটিভাবে বিজ্ঞানের লাইনে এক্সপার্ট হয়ে গিয়েছি। সেদিন বাথরুমের বাল্ব ফটাশ শব্দ করে ফিউজ হয়ে গেলো। আমি একটুও না ঘাবড়ে একটা বাল্ব কিনে নিজে লাগিয়ে দিলাম– আমার জীবনে প্রথম। বিল্টু একদিন আমাকে দেখিয়ে দিল, তারপর থেকে আমি নিজে নিজে মোড়ের একটা সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে ই-মেইল পাঠানো শুরু করে দিয়েছি। প্রথমে পাঠানোর লোক ছিল মাত্র দুইজন– সায়রা সায়েন্টিস্ট আর বিল্টু। বিল্টু আরেকদিন আমাকে শিখিয়ে দিল কেমন করে অন্য মানুষের ই-মেইল বের করতে হয়– সেটা জানার পর আমি অনেক জায়গায় ই-মেইল পাঠাতে শুরু করে দিলাম। প্রথমেই আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে খুব কড়া ভাষায় তাদের পররাষ্ট্রনীতি ঠিক করার জন্যে উপদেশ দিয়ে একটা ই-মেইল পাঠিয়ে দিলাম। জার্মানির চ্যান্সেলরের কাছে ই-মেইল পাঠিয়ে তাদের ইমিগ্রেশান পলিসি ঠিক করার জন্যে অনুরোধ করলাম। ব্রাজিল ওয়ার্ল্ডকাপে জিতে যাবার পর তাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে ই-মেইল পাঠিয়ে লিখে দিলাম, "শুধু ফুটবল খেললেই হবে না– পড়াশোনাতেও মনোযোগ দিতে হবে, কারণ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।" আমাদের দেশের মন্ত্রীদের বোকামির তালিকা দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা ই-মেইল পাঠাব ভাবছিলাম কিন্তু সবাই নিষেধ করল। তাহলে নাকি এসএসএফ-এর লোকজন এসে ক্যাঁক করে ধরে ডিবি পুলিশের হাতে দিয়ে দিবে। তারা রিমান্ডে নিয়ে রামধোলাই দিয়ে অবস্থা কেরোসিন করে দেবে। তবে আমি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় ই-মেইলে সম্পাদকদের কাছে চিঠি পাঠাতে লাগলাম। কয়েক দিনের মাঝেই 'দৈনিক মোমের আলো' পত্রিকায় একটা চিঠি ছাপা হয়ে গেলো। চিঠিটা এরকম–

শৃঙ্খলাবোধ এবং জাতির উন্নতি

পৃথিবীর সকল জাতি যখন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতেছে তখন আমরা শৃঙ্খলাবোধের অভাবে ক্রমাগত পশ্চাদমুখী হইয়া পড়িতেছি। উদাহরণ দেয়ার জন্যে বলা যায়, ট্রাফিক সার্জেন্ট যখন রাস্তার মোড়ে একটি ট্রাক ড্রাইভারকে আটক করিয়া ঘুস আদায় করে তখন কখনো পঞ্চাশ কখনো একশ' কখনো বা দুইশ' টাকা দাবি করেন। ট্রাক ড্রাইভাররা এই অর্থ দিতে গড়িমসি করেন। ইহাতে ট্রাফিক সার্জেন্টদের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। তাহারা তাহাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিতে পারেন না। আন্তর্জাতিক টেন্ডার পাওয়ার ব্যাপারে মন্ত্রীমহোদয়দের ঘুস দেওয়া হইতে শুরু করিয়া সচিবালয়ের পিয়নদেরকে পর্যন্ত ঘুস দিতে হয়। ঘুসের রেট নির্ধারিত নয় বলিয়া দর কষাকষি করিতে হয়। উভয় পক্ষের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়।

কাজেই আমি প্রস্তাব করিতেছি– অবিলম্বে ঘুসের রেট নির্ধারণ করিয়া জাতীয় সংসদে পাস করানোর পর তাহা সরকারি গেজেটভুক্ত করিয়া দেয়া হোক। যাহারা এই রেট অনুযায়ী ঘুস দিতে আপত্তি করিবেন তাহাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হোক। পুরো প্রক্রিয়াটি একটি শৃঙ্খলার ভিতরে আনিয়া জাতিকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করানোর পথ সুগম করানো হোক।

জাফর ইকবাল
পল্লবী, মিরপুর।

শুধু যে পত্রিকায় ই-মেইল ব্যবহার করে চিঠি পাঠাতে শুরু করলাম তা নয়, পরিচিত লোকজনকে আমার নতুন প্রতিভার কথা জানাতে শুরু করলাম। নতুন কারো সাথে পরিচয় হলেই তার ই-মেইল অ্যাড্রেস কী জিজ্ঞেস করতে শুরু করলাম এবং ই-মেইল অ্যাড্রেস না থাকলে সেটি নিয়ে বাড়াবাড়ি ধরনের অবাক হতে শুরু করলাম।

আমি যত ই-মেইল পাঠাতে শুরু করলাম সেই তুলনায় উত্তর আসত খুব কম। বিল্টু এবং সায়রা ছাড়া আর কেউ উত্তর দিত না, তাদের উত্তরও

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

হতো খুব ছোট– তিন-চার শব্দের। তবুও যেদিন একটা ই-মেইল পেতাম আমি উৎসাহে টগবগ করতে শুরু করতাম, রক্ত চনমন করতে শুরু করত। সায়রার বাসায় সেই সফটওয়্যার ডেভেলপার আর এক মাস পর হঠাৎ তার কাছ থেকে একটা ই-মেইল পেলাম, সেটাকে বাংলায় অনুবাদ করলে এরকম দাঁড়ায়–

মস্তিষ্কে স্টিমুলেশন সমস্যা সমাধান।
ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর। প্রোটোটাইপ প্রস্তুত।
গিনিপিগ প্রয়োজন। দেখা করুন। জরুরি।
সায়রা

সায়রার ই-মেইল বোঝা খুব কঠিন– বিল্টুর কাছে নিয়ে গেলে হয়তো মর্মোদ্ধার করে দিত কিন্তু আমি আর তাকে বিরক্ত করতে চাইলাম না। অনেকবার পড়ে আমার মনে হলো, সে একটা যন্ত্র তৈরি করেছে যেটা পরীক্ষা করার জন্যে গিনিপিগ দরকার। সে দেখা করতে বলেছে। গিনিপিগসহ নাকি গিনিপিগ ছাড়া যেতে বলেছে ঠিক বুঝতে পারলাম না। এক হালি গিনিপিগ নিয়েই যাব যাব চিন্তা করে কাঁচাবাজারে বিকেল বেলা খুঁজে দেখলাম, কেউ জিনিসটা চিনতেই পারল না। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত গিনিপিগ ছাড়াই সায়রার বাসায় হাজির হলাম।

আমাকে দেখে সায়রার মুখ একশ' ওয়াট বাল্বের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দরজা খুলে বলল, "এই তো আমার গিনিপিগ চলে এসেছে।"

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "আসলে আনতে পারি নাই। কাঁচাবাজারে খোঁজ করেছিলাম, সেখানে নাই।"

"কী নাই?"

"গিনিপিগ।"

সায়রা আমার কথা শুনে হি হি করে হেসে উঠল, মেয়েটা হাসে কম, কিন্তু যখন হাসে তখন দেখতে বেশ ভালোই লাগে। আমি বললাম, "হাসছেন কেন?"

"আপনার কথা শুনে।"

"আমি কি হাসির কথা বলেছি?"

"হ্যাঁ।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কখন?"

"এই যে আপনি বললেন, কাঁচাবাজার থেকে গিনিপিগ আনতে চেয়েছেন। এটাই হাসির কথা– কারণ কাঁচাবাজার থেকে গিনিপিগ আনতে হবে না। আপনিই গিনিপিগ।"

আমি থমতম খেয়ে বললাম, "আমিই গিনিপিগ?"

"যার উপরে এক্সপেরিমেন্ট করা হয় সে হচ্ছে গিনিপিগ। আপনার উপর আমার ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটরটা পরীক্ষা করব– তাই আপনি হবেন আমার গিনিপিগ।"

আমি আঁতকে উঠে বললাম, "আমার উপরে পরীক্ষা করবেন?"

"তা না হলে কার উপরে করব? কে রাজি হবে?"

যুক্তিটার মাঝে কিছু গোলমাল আছে, কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি চিন্তা করতে পারি না, তাই এবারেও গোলমালটা ধরতে পারলাম না। আমতা আমতা করে বললাম, "ইয়ে মানে– ব্রেনের মাঝে স্টিমুলেশান– কোনো সমস্যা হবে না তো?"

"এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপার, কখন কী সমস্যা হয় সেটা কি কেউ আগে থেকে বলতে পারে? পারে না।"

"তাহলে?"

সায়রা মুখ গম্ভীর করে বলল, "আমিও সেটা বলতে চাচ্ছি। ব্রেনের মাঝে সরাসরি স্টিমুলেশান দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা? লেভেলের তারতম্য হতে পারে, বেশি হয়ে যেতে পারে, ব্রেন ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে– সেটা টেস্ট করার জন্যে আমি ভলান্টিয়ার কোথায় পাব? সারা পৃথিবীতে কেউ রাজি হতো না। তখন হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়ল– আপনাকে ই-মেইল পাঠালাম, আপনি এক কথায় রাজি হয়ে চলে এলেন। কী চমৎকার ব্যাপার।"

আমি আমতা আমতা করে বললাম, "না, মানে ইয়ে– বলছিলাম কী–"

সায়রা বলল, "না না– আপনার কিছু বলার দরকার নেই, আমি জানি আপনি কী বলবেন। আপনি বলতে চাইছেন যে আপনি বিজ্ঞানের 'ব'ও জানেন না– কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে আপনি জীবন পর্যন্ত দিতে রাজি আছেন। ঠিক কি না?"

আমি ঢোক গিলে কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না। সায়রা মধুর ভঙ্গিতে হেসে বলল, "বিজ্ঞানের উন্নতি কি একদিনে হয়েছে? হয়নি। হাজার হাজার বছর লেগেছে। আমরা শুধু বিজ্ঞানীদের নাম জানি– কিন্তু এই হাজার হাজার

বছর ধরে যে লক্ষ লক্ষ ভলান্টিয়ার বিজ্ঞানের জন্য তাদের জীবন দিয়েছে তাদের নাম আমরা জানি না। জানার চেষ্টাও করি না।"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

"ভ-ভ-ভলান্টিয়াররা মারা যায়?"

"যায় না? অবশ্যই যায়। সায়রা মৃদু হেসে বলল, "কিন্তু এখন সেটা নিয়ে আপনার সাথে কথা বলতে চাই না– আপনি নার্ভাস হয়ে যাবেন। আসেন আমার সাথে।"

তেলাপোকা যেভাবে কাঁচপোকার পিছু পিছু যায় আমি অনেকটা সেভাবে সায়রার পিছু পিছু তার ল্যাবরেটরি ঘরে গেলাম। একটা টেবিলের উপর নানারকম যন্ত্রপাতি। মনিটরে নানারকম তরঙ্গ খেলা করছে, নানারকম আলো জ্বলছে এবং নিভছে। যন্ত্রপাতিগুলো থেকে ভোঁতা এক ধরনের শব্দ বের হচ্ছে। টেবিলের পাশে ডেন্টিস্টের চেয়ারের মতো একটা চেয়ার। তার কাছে একটা টুল, সেই টুলে মোটর সাইকেল চালানোর সময় যেরকম হেলমেট পরে সেরকম একটা হেলমেট। হেলমেট থেকে নানা ধরনের তার বের হয়ে এসেছে, সেগুলো যন্ত্রপাতির নানা জায়গায় গিয়ে লেগেছে। সায়রা হেলমেটটা দেখিয়ে বলল, "এই যে ইকবাল সাহেব, এইটা হচ্ছে আমার নিজের হাতে তৈরি ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর।"

"ট্রা-ট্রা-ট্রা–" আমি কয়েকবার যন্ত্রটার নাম বলার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, "কী হয় এই যন্ত্রটা দিয়ে?"

"মনে আছে, খাবারের স্বাদ নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম?"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"মনে আছে, আমি বলেছিলাম ব্রেনের নির্দিষ্ট কোনো একটা জায়গায় স্টিমুলেশান দিয়ে খাবারের স্বাদ পাওয়া সম্ভব?"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"মনে আছে, তখন বিল্টু বলেছিল সেটা করার জন্যে ব্রেন সার্জারি করে ব্রেনের ভেতরে কোন ধরনের ইলেকট্রড বসাতে হবে?"

আমি আবার মাথা নাড়লাম, "হ্যাঁ, মনে আছে।"

সায়রা একগাল হেসে বলল, "আসলে ব্রেনের ভেতরে গিয়ে স্টিমুলেশান দিতে হবে না। বাইরে থেকেই দেওয়া সম্ভব।"

"বাইরে থেকেই?"

"হ্যাঁ। খুব হাই ফ্রিকোয়েন্সির ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে বাইরে থেকে ব্রেনের ভিতরে স্টিমুলেশান দেয়া যায়। সত্যি কথা বলতে কী, যন্ত্রটা এর

মাঝে আবিষ্কার হয়ে গেছে। আমেরিকার ল্যাবরেটরিতে সেটা ব্যবহার হয়। যন্ত্রটার নাম ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর। এটা কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে এনে এখানে তৈরি করেছি। সবকিছু রেডি– এখন শুধু পরীক্ষা করে দেখা।"

"পরীক্ষা করে দেখা?"

"হ্যাঁ। আপনার মাথায় লাগিয়ে হাই ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেব– আপনি এক ধরনের স্বাদ অনুভব করতে থাকবেন। মনে হবে পোলাও খাচ্ছেন।"

"যদি মনে না হয়?" আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "যদি অন্য কিছু হয়?"

"তাহলে সেটা দেখতে হবে অন্য কী হচ্ছে। কেন হচ্ছে? কীভাবে হচ্ছে– এটাই হচ্ছে গবেষণা। এটাই হচ্ছে বিজ্ঞান।"

আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু সায়রার সামনে আমি না করতে পারলাম না। আমাকে রীতিমতো জোর করে ডেন্টিস্টের চেয়ারে বসিয়ে সে বলল, "চেয়ারের হাতলে হাত রাখেন।"

আমি হাতলের উপর হাত রাখতেই নাইলনের দড়ি দিয়ে সায়রা হাতগুলো বেঁধে ফেলল। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "হাত বাঁধছেন কেন?"

"ব্রেনের মাঝে স্টিমুলেশান দিচ্ছি– কী হয় কে বলতে পারে? হয়তো হাত-পা ছুঁড়ে আপনার শরীরে খিচুনি শুরু হয়ে যাবে। রিস্ক নিয়ে লাভ আছে?"

আমি আর কোনো কথা বলার সাহস পেলাম না। চুপচাপ চেয়ারে বসে রইলাম। বুক ঢাকের মতো শব্দ করে ধকধক করতে লাগল, গলা শুকিয়ে কাঠ। সায়রা কাছে এসে আমার মাথায় হেলমেটটি পরিয়ে দিয়ে স্ট্র্যাপ দিয়ে সেটা থুতনির সাথে বেঁধে দিয়ে তার যন্ত্রপাতির সামনে চলে গেলো। নানারকম সুইচ টেপাটেপি করে বলল, "জাফর ইকবাল সাহেব, আপনি চেয়ারে মাথা রেখে রিলাক্স করেন।"

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, "করছি।"

"স্টিমুলেশান দেওয়ার পর আমি আপনাকে প্রশ্ন করব। আপনি তখন সেই প্রশ্নের উত্তর দেবেন। ঠিক আছে?"

আমি আবার চিঁ চিঁ করে বললাম, "ঠিক আছে।"

সায়রা একটা হ্যান্ডেল টেনে বলল, "এই যে আমি স্টিমুলেশান দিতে শুরু করেছি। দশ ডিবি পাওয়ার, কিছু টের পাচ্ছেন?"

আমি ভেবেছিলাম মাথার ভেতরে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে শুরু করবে কিন্তু কিছুই ঘটল না। বললাম, "না।"

"ঠিক আছে পাওয়ার বাড়াচ্ছি। বারো, তেরো, চৌদ্দ ডিবি। এখন কিছু টের পাচ্ছেন?"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

আমি কিছুই টের পেলাম না, শুধু হঠাৎ করে একটা দুর্গন্ধ নাকে ভেসে এলো। বললাম, "না, কিছুই টের পাচ্ছি না। তবে কোথা থেকে জানি দুর্গন্ধ আসছে।"

সায়রা অবাক হয়ে বলল, "দুর্গন্ধ?"

"হ্যাঁ।"

"কী রকম দুর্গন্ধ?"

"ইঁদুর মরে গেলে যেরকম দুর্গন্ধ হয়।"

সায়রা এদিক সেদিক শুঁকে বলল, "নাহ্, কোনো দুর্গন্ধ নেই তো? যাই হোক, পরে দেখা যাবে দুর্গন্ধ কোথা থেকে আসছে। এখন আমার ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটরটা পরীক্ষা করি। আপনি যেহেতু কোনো কিছু টের পাচ্ছেন না, সিগন্যালটা আরেকটু বাড়াই। এই যে ষোল-সতেরো-আঠারো ডিবি।"

হঠাৎ একটা বিদঘুটে জিনিস ঘটে গেলো– কোথা থেকে একটা মরা ইঁদুর কিংবা ব্যাঙ লাফিয়ে আমার মুখের ভেতর ঢুকে গেলো। প্রচণ্ড দুর্গন্ধে আমার বমি এসে যায়। আমি ওয়াক থু করে মুখ থেকে মরা ব্যাঙ কিংবা ইঁদুরটা বের করতে চেষ্টা করলাম কিন্তু বের করতে পারলাম না। হাত-পা বাঁধা, তাই হাত দিয়েও টেনে বের করতে পারলাম না। আমি গোঙানোর মতো শব্দ করতে লাগলাম। সায়রা উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"মুখের ভিতরে–"

"মুখের ভিতরে কী?"

"কী যেন একটা ঢুকে গেছে। পচা ইঁদুর, না হয় ব্যাঙ। ছিঃ, কী দুর্গন্ধ!" আমি প্রায় বমি করে দিচ্ছিলাম।

সায়রা আমার কাছে এসে মুখের ভেতরে উঁকি দিয়ে বলল, "না! আপনার মুখে তো কিছু নেই। সব আপনার কল্পনা।"

আমি জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললাম, "না না, আছে। ভালো করে দেখেন।" আমি মুখ বড় করে হা করলাম।

সায়রা বলল, "আপনার চমৎকার একটা স্বাদের অনুভূতি পাওয়ার কথা। যতক্ষণ না পাচ্ছেন ততক্ষণ পাওয়ার বাড়াতে থাকি।"

আমি চিৎকার করে 'না' করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সায়রা আমার কথা [illegible] পাওয়ার আরো বাড়িয়ে দিল। আর আমার মনে হলো কেউ যেন আমাকে হা করিয়ে এক বালতি পচা গোবর আমার গলা দিয়ে ঠেসে দিতে শুরু করেছে। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চাইল, ছটফট করে আমি একটা গগন বিদারী চিৎকার দিলাম। আমার চিৎকার শুনে সায়রা নিশ্চয়ই হ্যান্ডেলটা নামিয়ে স্টিমুলেটরের পাওয়ার বন্ধ করে দিয়েছিল, তখন হঠাৎ করে ম্যাজিকের মতো পচা গোবর, মরা ইঁদুর আর ব্যাঙ, দুর্গন্ধ সবকিছু চলে গেলো। আমি এতো অবাক হলাম যে বলার মতো নয়– রাগ হলাম আরো বেশি। সায়রার দিকে চোখ পাকিয়ে বললাম, "আপনার এই যন্ত্র মোটেই কাজ করছে না। ভালো স্বাদ পাবার কথা অথচ পচা দুর্গন্ধ পাচ্ছি।"

সায়রা চোখ বড় বড় করে বলল, "কী বলছেন আপনি! ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর পুরোপুরি কাজ করছে। শুধুমাত্র ম্যাগনেটিক স্টিমুলেশান দিয়ে আপনাকে স্বাদের অনুভূতি দিয়েছি। ভালো না হোক খারাপ তো দিয়েছি!"

"সেটা এক জিনিস হলো?"

"এক না হলেও কাছাকাছি।"

"পচা ইঁদুরের স্বাদ আর পোলাওয়ের স্বাদ কাছাকাছি হতে পারে?"

সায়রা বিশ্বজয় করার মতো একটা ভঙ্গি করে বলল, "হতে পারে। ব্রেনের যে অংশে স্বাদের অনুভূতি সেখানে ভালো আর খারাপ অনুভূতি খুব কাছাকাছি। খারাপটা যখন পেয়েছি কাছাকাছি খুঁজলে ভালোটাও পাব।"

"খুঁজলে? কীভাবে খুঁজলে?"

"ট্রায়াল এন্ড এরর। আপনার ব্রেনে যেখানে স্টিমুলেশান দিয়েছি, এখন তার থেকে একটু সরিয়ে অন্য জায়গায় দেব। সেখানে না হলে অন্য জায়গায়, এভাবে খোঁজাখুঁজি করলেই পেয়ে যাব।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "আমি রাজি না। আমার ব্রেনে আপনাকে আমি আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেব না।"

সায়রা মধুরভাবে হেসে বলল, "আপনি এটা কী বলছেন? এতো আগ্রহ নিয়ে ভলান্টিয়ার হয়েছেন অথচ এখন বলছেন রাজি না। বিজ্ঞানের জগতে এটা জানাজানি হয়ে গেলে কী হবে আপনি জানেন?"

"যা হয় হোক।"

"ছেলেমানুষি করবেন না জাফর ইকবাল সাহেব–" বলে সায়রা আমার মাথার [illegible] লাগানো হেলমেটটার মাঝে কী একটা করতে লাগল। খানিকক্ষণ [illegible] কাছে ফিরে গিয়ে বলল– "এখন অন্য জায়গায় গিয়ে স্টিমুলেশান দিচ্ছি। দেখি কী হয়?"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

আমি প্রচণ্ড রেগে-মেগে বললাম, "না, কিছুতেই না।"

কিন্তু তার আগেই সায়রা হ্যান্ডেলটা টেনে ধরেছে এবং হঠাৎ করে আমার সমস্ত রাগ কেমন করে জানি উবে গেলো। শুধু যে রাগ অদৃশ্য হয়ে গেলো তাই নয়, আমার হঠাৎ করে কেন জানি হাসি পেতে শুরু করল। আমি সায়রার দিকে তাকালাম এবং তার চেহারাটা এতো হাস্যকর মনে হতে লাগল যে আমি আর হাসি আটকে রাখতে পারলাম না, হঠাৎ খিকখিক করে হেসে ফেললাম।

সায়রা ভুরু কুঁচকে বলল, "কী হলো, আপনি হাসছেন কেন?"

"না, না– এমনি।"

"এখন একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা হচ্ছে– এর মাঝে যদি হাসি তামাশা করেন তাহলে কাজ করব কেমন করে?"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি আর হাসব না–" বলেও আমি আবার হেসে ফেললাম, হাসতে হাসতে বললাম, "আসলে আপনি একটু সরে দাঁড়ান। আপনাকে দেখলেই হাসি পেয়ে যাচ্ছে।"

সায়রা চোখ পাকিয়ে বলল, "কী বললেন আপনি? আমাকে দেখলেই হাসি পেয়ে যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ, আপনার চেহারাটা– হি হি হি–"

সায়রা বেজার মুখ করে বলল, "কী হয়েছে আমার চেহারায়?"

"আয়নাতে কখনো দেখেননি? মনে হয় নাকটা কেউ অন্য জায়গা থেকে তুলে সুপার গ্লু দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে!" আমি হাসি থামাতে পারি না, হি হি করে হাসতেই থাকি।

সায়রা থমথমে গলায় বলল, "সুপার গ্লু দিয়ে?"

আমি কোনোমতে হাসি থামিয়ে বললাম, "হ্যাঁ। সুপার গ্লু দিয়ে লাগানোর পর মনে হয় দেড় টনি একটা ট্রাক আপনার নাকের উপর দিয়ে চলে গেছে। পুরো নাকটা ফ্ল্যাট, চ্যাপ্টা এবং ধ্যাবড়া। হি হি হি।"

সায়রা খানিকক্ষণ আমার দিকে সরু চোখে তাকিয়ে রইল, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "দেখেন জাফর ইকবাল সাহেব, আমার ধারণা

ছিল আপনি খুব বুদ্ধিমান মানুষ না হলেও মোটামুটি একজন ভদ্র মানুষ। আমার সাথে ভদ্রতাটুকু বজায় রাখবেন। আপনি আমার চেহারা নিয়ে হাসাহাসি করবেন সেটা আমি কখনোই আন্দাজ করতে পারিনি।"

আমি অনেক কষ্ট করে হাসি থামিয়ে বললাম, "আই অ্যাম সরি, সায়রা। আমার অন্যায় হয়েছে– এই যে আমি মুখে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলাম, আর আমি হাসব না।"

"হ্যাঁ, শুধু শুধু ফ্যাক ফ্যাক করে হাসবেন না। আপনার ব্রেনে এখন দশ ডিবি পাওয়ার যাচ্ছে। এটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছি, আপনার কী অনুভূতি হয় বলবেন। ঠিক আছে?"

সায়রার মাস্টারনির মতো কথা বলার ভঙ্গি দেখে হাসিতে আমার পেট ভুট ভুট করছিল, কিন্তু আমি অনেক কষ্ট করে হাসি আটকে রেখে বললাম, "ঠিক আছে।"

সায়রা হ্যান্ডেলটা টেনে বলল, "দশ থেকে বাড়িয়ে চৌদ্দ ডিবি করে দিলাম।"

সাথে সাথে আমি অট্টহাসিতে ফেটে পড়লাম।

সায়রা রেগে গিয়ে বলল, "কী হলো? আপনাকে বললাম হাসবেন না– শুধু বলবেন কেমন লাগছে। আবার আপনি হাসছেন?"

হাসতে হাসতে আমার চোখে পানি এসে গেলো, কোনোমতে নিজেকে থামাতে পারছি না। সায়রা ধমক দিয়ে বলল, "কেন আপনি হাসছেন?"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "হি হি হি– আপনার চোখ!"

"আমার চোখ?"

"হ্যাঁ, মনে হয় ইঁদুরের চোখ! কুতকুত করে তাকিয়ে আছেন। হি হি হি।"

সায়রা কঠিন মুখ করে বলল, "আমি, কুতকুত করে তাকিয়ে আছি?"

"হ্যাঁ।" আমি কোনোমতে হাসি আটকে বললাম, "আপনার চোখ দেখলে কী মনে হয় জানেন?"

"কী?"

"কেউ যেন দুইটা তরমুজের বিচি লাগিয়ে দিয়েছে। কালো কালো দুইটা বিচি। হি হি হি–"

সায়রার মুখ এবারে রাগে লাল হয়ে গেলো এবং তখন তাকে দেখে আমার হঠাৎ করে পাকা টমেটোর কথা মনে পড়ে গেলো। আমি অনেক

কষ্ট করে হাসি থামিয়ে রাখলাম। সায়রা পাথরের মতো মুখ করে বলল, "আপনাকে নিয়ে কাজ করা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে জাফর ইকবাল সাহেব। আপনি [illegible] তো করছেনই না শুধু আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছেন।"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

"আর করব না। আর করব না সায়রা। খোদার কসম। হাত দুটো খোলা থাকলে দুই হাত জোড় করে আপনার কাছ থেকে মাপ চাইতাম।"

"ঠিক আছে। এবারে একটু মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেন। আপনার অনুভূতিটি কী বোঝার চেষ্টা করে আমাকে বলার চেষ্টা করুন। বুঝেছেন কী বলেছি?"

"বুঝেছি। একেবারে জলবৎ তরলং।"

"এইবারে পাওয়ার আরেকটু বাড়িয়ে দিচ্ছি। চৌদ্দ ডিবি থেকে বাড়িয়ে একেবারে বিশ ডিবি। কেমন লাগছে এখন?"

আমি কোনো কথা না বলে অনেক কষ্ট করে হাসি আটকে রাখার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ করে আমার মনে হতে লাগল, সায়রার থুতনিতে যদি ছাগলের মতো একগোছা দাড়ি থাকত তাহলে কী হতো? ব্যাপারটা মাথা থেকে যতই সরিয়ে রাখার চেষ্টা করি না কেন তাতে যেন কোনো লাভ হলো না– দৃশ্যটা বার বার আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল এবং আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে হঠাৎ করে হাসিতে গড়িয়ে পড়লাম। সায়রার চোখ দিয়ে এবারে একেবারে আগুন বের হতে লাগল– সে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "এবারে আপনি আমার কোন জিনিসটা দেখে হাসছেন?"

আমি হাসি থামিয়ে বললাম, "সেটা শুনলে আপনিও হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যাবেন।"

"তাই নাকি?" সায়রা ঠাণ্ডা গলায় বলল, "শুনি ব্যাপারটা।"

"আপনার থুতনিতে যদি ছাগলের মতো একটু দাড়ি থাকত তাহলে কী কাণ্ড হতো চিন্তা করতে পারেন?" এরকম হাসির একটা ব্যাপার শুনেও সায়রা একটুও হাসল না– কিন্তু আমি হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলাম।

সায়রা খানিকক্ষণ আমার দিকে শীতল চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, "বেশ! আপনি যদি ঠিক করে থাকেন আমাকে সাহায্য করবেন না তাহলে তাই হোক। আপনি যদি আপনার অনুভূতিটা বলতে না চান তাহলে

বলবেন না।" সায়রার নাকের পাটা ফুলে উঠল, চোখ থেকে আগুন বের হতে লাগল, দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "আপনাদের মতো মানুষের সাহায্য ছাড়াই আমি আমার রিসার্চ চালিয়ে যাব। আমি আমার স্টিমুলেটর বন্ধ করে দিচ্ছি। আপনি আপনার বাসায় যান।"

সায়রার রাগ হয়ে কথা বলার ভঙ্গিটা এতো মজার যে হাসিতে আমার পেট ফেটে যাচ্ছিল। আমি দেখলাম সার্কাসের জোকারদের মতো সে তার যন্ত্রের হ্যান্ডেলটা টেনে ধরে স্টিমুলেটরের পাওয়ার বন্ধ করে দিল। মুহূর্তে আমার সমস্ত হাসি থেমে গেলো। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম– মানুষ কতো বড় গাধা হলে আমার মতোন এরকমভাবে বোকার মতো হাসতে পারে? শুধু কী হাসি– নির্বোধের মতো সায়রার চেহারা নিয়ে কী সব বলেছি? আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমি ফ্যাল ফ্যাল করে সায়রার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সায়রা আমার কাছে এসে আমার হাতের বাঁধন খুলতে খুলতে বলল, "আপনাকে এখানে আসতে বলাটাই আমার অন্যায় হয়েছে। শুধু বলবেন আপনার স্বাদের অনুভূতিটি কী, ঝাল না মিষ্টি, টক না তেতো, কিন্তু তা না করে আমার চেহারা নিয়ে টিটকারি মারতে লাগলেন।"

আমার লজ্জায় মাথা কাটা যেতে লাগল। আমি কেমন করে এরকম আজে-বাজে কথা বলতে পারলাম? সায়রার নাক তো এমন কিছু চ্যাপ্টা নয়, চোখগুলোও বেশ সুন্দর। অথচ একটু আগে একেবারে গাধার মতো সেগুলো নিয়ে হাসাহাসি করেছি। কী লজ্জা! কী লজ্জা!

লজ্জার ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করতে গিয়েই হঠাৎ করে পুরো ব্যাপারটা আমার পরিষ্কার হয়ে গেলো। সায়রার এই যন্ত্র স্টিমুলেশান দিয়ে ঝাল মিষ্টি স্বাদ নয়– আমার হাসির ব্যাপারটা বের করে এনেছে। কী আশ্চর্য! এই সহজ জিনিসটা আমিও বুঝতে পারছি না, সায়রাও বুঝতে পারেনি। আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, "সায়রা!"

সায়রা একেবারে আইসক্রিমের মতো ঠাণ্ডা গলায় বলল, "বলুন।"

"আপনি বুঝতে পেরেছেন, কী হয়েছে?"

"হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। আমার নাকের উপর দিয়ে দেড় টনি ট্রাক চলে গেছে। আমার চোখগুলো ইঁদুরের মতো কুতকুতে আর আমার থুতনিতে একগোছা ছাগল দাড়ির খুব দরকার।"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

"না না, না না।" আমি প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললাম, "আপনার এই যন্ত্র এটা করেছে। আমাকে হাসাতে শুরু করেছে। তুচ্ছ কারণে হাসি। অকারণে হাসি। পাগলের মতো হাসি!"

সায়রা খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি সত্যি বলছেন? আপনি আমার সাথে কোনো ধরনের মশকরা করছেন না?"

"আপনার সঙ্গে কেন আমি মশকরা করব? সত্যিই এটা হয়েছে!"

ধীরে ধীরে হঠাৎ করে সায়রার মুখ একেবারে টিউবলাইটের মতো জ্বলে উঠল, চোখ বড় বড় করে বলল, "তার মানে আমার ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর দিয়ে মানুষের সবরকম অনুভূতি তৈরি করে দিতে পারব। হাসি কান্না রাগ ভালোবাসা–"

"হ্যাঁ।" আমি মাথা নাড়লাম, "সুখ দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা।"

সায়রা বলল, "ন্যায় এবং অন্যায়। সৎ এবং অসৎ।"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "সত্যি? সৎ মানুষকে অসৎ, অসৎ মানুষকে সৎ বানাতে পারবেন?"

সায়রা টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "অবশ্যই পারব। অবশ্যই!"

আমি ভেবেছিলাম সায়রা একটু বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছে, কিন্তু সে যে সত্যি কথা বলছে সেটা কয়দিন পরেই আমি টের পেয়েছিলাম।

পরের একমাস আমি সায়রার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখলাম। আমি হচ্ছি তার গিনিপিগ, আমি যদি যোগাযোগ না রাখি কেমন করে হবে? অনেক সময় নিয়ে ঘেঁটেঘুঁটে সে আমার মস্তিষ্কের সব কিছু বের করে ফেলল। যেমন আমার মস্তিষ্কের একটা জায়গা আছে, সেখানে স্টিমুলেশান দিলে কেমন জানি কান্না পেতে থাকে। তখন আমার সারা জীবনের সব দুঃখের কথাগুলো মনে পড়ে গেলো, সেই ছোটবেলায় একটা ফুলদানি ভেঙেছিলাম বলে আমার মা কানে ধরে একটা চড় মেরেছিলেন, সেই কথাটা মনে পড়ে বুকটা প্রায় ভেঙে যাবার মতো অবস্থা হলো। পাওয়ার একটু বাড়িয়ে দিতেই আমি এতো বড় ধাড়ি মানুষ ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললাম– জিনিসটা একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যাপার, তা না হলে তো লজ্জাতেই মাথা কাটা যেত! কান্না পাবার অংশের কাছাকাছি আর এটা জায়গাতে স্টিমুলেশান দিতেই বুকের ভেতরে কেমন যেন ভালোবাসার জন্ম

হয়। বিল্টুর জন্যে ভালোবাসা, অফিসের বড় সাহেবের জন্যে ভালোবাসা, সায়রার জন্যে ভালোবাসা, এমনকি গত রাতে মশারির ভেতরে ঢুকে পড়া যে বেয়াদব মশাটাকে রাত দুটোর সময় মারতে হয়েছিল সেটার জন্যেও কেবল যেন ভালোবাসা এবং মায়া হতে থাকে।

অনুভূতির এইসব জটিল জায়গা থেকে সরে যাবার পর সায়রা আমার মস্তিষ্কের সৃজনশীল জায়গাগুলো বের করে ফেলল। সেখানে এক জায়গায় স্টিমুলেশান দিতেই আমার ভেতরে একটা চিত্রশিল্পীর জন্ম হয়ে গেলো। কাগজে একটা ছবি আঁকার জন্যে হাত নিশপিশ করতে শুরু করল। বন্ধুর পাল্লায় পড়ে একবার চিত্রপ্রদর্শনীতে গিয়ে যে আধুনিক পেইন্টিংগুলোর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিনি হঠাৎ করে সেটার অন্তর্নিহিত অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো। মস্তিষ্কের এই এলাকার কাছাকাছি নিশ্চয়ই কবিতা লেখার ব্যাপারটি আছে, সেখানে স্টিমুলেশান দিতেই আমার মাথার মাঝে কবিতা গুড় গুড় করতে লাগল। সত্যি কথা বলতে কী, আমি সায়রার দিকে তাকিয়ে মুখে মৃদু মৃদু হাসি নিয়ে বললাম–

"হে সায়রা
তোমার আবিষ্কার যেন আকাশের পায়রা"

আমার নিজেকে একেবারে কবি কবি মনে হতে লাগল। দাড়ি না কামিয়ে চুল লম্বা করার জন্যে হঠাৎ করে ভেতর থেকে কেমন যেন চাপ অনুভব করতে থাকলাম।

মস্তিষ্কের মাঝে কবিতার এলাকার খুব পাশেই নিশ্চয়ই গানের এলাকা। সেখানে স্টিমুলেশান দিতেই আমার গান গাইবার জন্য গলা খুশখুশ করতে লাগল। বেসুরো গান নয়, একেবারে তাল-লয়-ছন্দ মিলিয়ে গান। গুনগুন করে দুই লাইন গেয়েও ফেলেছিলাম কিন্তু তার আগেই সায়রা মাথার মাঝে জায়গা পাল্টে দিল।

ছবি, কবিতা এবং গানের কাছাকাছি জায়গায় আমার অঙ্কের এলাকাটা পাওয়া গেল। সেখানে স্টিমুলেশান দিতেই আমি জীবনে এই প্রথমবার বুঝতে পারলাম যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ মিলিয়ে বিদঘুটে এবং জটিল অঙ্ককে কেন সরল অঙ্ক বলে! শুধু তাই না, তেল মাখানো একটা বাঁশ বেয়ে ওঠা এবং পিছলে পড়ার একটা অঙ্ক আছে যেটা আমি আগে কখনোই বুঝতে পারিনি– সেই অঙ্কটা হঠাৎ করে আমার কাছে পানির মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো। আমার মস্তিষ্কের এই জায়গায় ভালোমতো স্টিমুলেশান দিলে

আমি নিশ্চয়ই ল.সা.গু. গ.সা.গু. ব্যাপারটাও বুঝে ফেলতাম কিন্তু সায়রা তার আর চেষ্টা করল না।

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

মস্তিষ্কের এরকম মজার মজার জায়গা খুঁজে বের করার সাথে সাথে কিছু বিপজ্জনক জায়গাও বের হলো। তালুর কাছাকাছি একটা জায়গায় স্টিমুলেশান দিতেই আমি হঠাৎ করে এতো ভয় পেয়ে গেলাম যে আর সেটা বলার মতো নয়। সায়রার ল্যাবরেটরিটিকে মনে হতে লাগল একটা অন্ধকার গুহা, সায়রাকে মনে হতে লাগল একটা পিচাশী। তার চোখের দিকে আমি তাকাতে পারছিলাম না। মনে হতে লাগল, সে বুঝি এক্ষুণি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলার রগে কামড় দিয়ে সব রক্ত শুষে খেয়ে ফেলবে। ভয় পেয়ে আমি যা একটা চিৎকার দিয়েছিলাম সেটা আর বলার মতো নয়। ব্যাপারটা টের পেয়ে সায়রা সাথে সাথে পাওয়ার বন্ধ করে আমার জান বাঁচিয়েছে।

মাথার সামনের দিকে একটা অংশে স্টিমুলেশান দিতেই আমি কেমন জানি অসৎ হয়ে গেলাম। গালকাটা বক্কর, তালুছোলা ফাক্কু এরকম সব সন্ত্রাসী, পাজি সাংসদ আর অসৎ মন্ত্রীদের কেমন জানি নিজের মানুষ বলে মনে হতে লাগল! সায়রাকে একটা চেয়ারের সাথে বেঁধে কীভাবে তার বাসার সবকিছু খালি করে নিয়ে ধোলাই খালে বিক্রি করে দেয়া যায়– তার একটা পরিষ্কার পরিকল্পনা আমার মাথার মাঝে চলে এলো। শুধু তাই না, আমার মনে হতে লাগল খামাখা কাজ-কর্ম করে সময় নষ্ট না করে একটা ব্যাংক ডাকাতি করলে মন্দ হয় না। কোথা থেকে সস্তায় সে জন্যে অস্ত্র কেনা যাবে সেই ব্যাপারটাও মাথার মাঝে চলে এলো। এতদিন কেন চুরি-চামারি করিনি– সেটা ভেবে কেমন যেন দুঃখ দুঃখ লাগতে লাগল। আরো বেশি সময় স্টিমুলেশান দিলে কী হতো কে জানে, কিন্তু সায়রা হ্যান্ডেল টেনে পাওয়ার কমিয়ে আনল।

তবে আমার মস্তিষ্কের সবচে' ভয়ঙ্কর জায়গাটা ছিল মাথার তালু থেকে একটু ডানদিকে। সায়রা যখন আমার এই জায়গাটা বের করে স্টিমুলেশান দিয়েছে তখন হঠাৎ করে আমার কেমন জানি রাগ উঠতে থাকে। কেন ফ্যানটা ঘুরছে সেটা নিয়ে রাগ, কেন আমি ডেন্টিস্টের চেয়ারের মতো চেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছি সেটা নিয়ে রাগ, কেন মাথায় হেলমেটের মতো এই জিনিসটা সেটা নিয়ে রাগ, সায়রা কেন যন্ত্রপাতির সামনে বসে আছে সেটা নিয়ে রাগ। শুধু তাই নয়– হঠাৎ করে একটা টিকটিকি ডেকে

উঠল আর আমি সেই টিকটিকির উপরে এমন রেগে উঠলাম যে বলার মতো নয়। আমি যে রেগে উঠেছি সায়রা সেটা বুঝতে পারেনি। সে হ্যান্ডেল টেনে পাওয়ারটা একটু বাড়িয়ে দিল। সাথে সাথে আমি রাগে একেবারে অন্ধ হয়ে গেলাম। কী করছি বুঝতে না পেরে আমি আঁ আঁ করে চিৎকার করে সায়রার গলা টিপে ধরার জন্যে ছুটে গেলাম। ভাগ্যিস সায়রা হ্যান্ডেল টেনে পাওয়ার কমিয়ে দিল, তা-না হলে কী যে হতো চিন্তা করেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়! কে জানে হয়তো খুনের দায়ে বাকি জীবনটা জেলখানাতেই কাটাতে হতো!

যাই হোক শেষ পর্যন্ত মাসখানেক পরে যন্ত্রটা যখন শেষ হলো সেটা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। একটা বাক্সের মতো জিনিসে সব ধরনের ইলেকট্রনিক্স, সেখান থেকে একটা মোটা তার গিয়েছে লাল রঙের একটা হেলমেটে। হেলমেটটা মাথায় দিলে খুব হালকা টুংটাং একটা বাজনা শোনা যায়। এই যন্ত্রটা কন্ট্রোল করার জন্যে টিভির রিমোট কন্ট্রোলের মতো একটা জিনিস, সেখানে লেখা আছে, 'হাসি', 'রাগ', 'ভালোবাসা', 'কবিত্ব ভাব' এই ধরনের কথা-বার্তা। নির্দিষ্ট সুইচটা টিপে ধরলেই হেলমেট পরা মানুষের মাথায় সেই অনুভূতিগুলো আমার মস্তিষ্ক ব্যবহার করে বের করা হয়েছে চিন্তা করেই গর্বে আমার বুক দশ হাত ফুলে উঠতে লাগল।

সবকিছু দেখে আমি সায়রাকে বললাম, "এই আবিষ্কারের কথাটা খবরের কাগজে দিতে হবে।"

"খবরের কাগজে?"

"হ্যাঁ।" আমি এক গাল হেসে বললাম, "বড় করে একটা রঙিন ছবি থাকবে। আমি হেলমেট পরে হাসি হাসি মুখে বসে আছি, পাশে আপনি যন্ত্রের হ্যান্ডল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। নিচে ব্যানার হেড লাইন–

বাঙালি মহিলার যুগান্তকারী আবিষ্কার–
মানুষের অনুভূতি এখন হাতের মুঠোয়।

সায়রা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি এতটুকু নিরুৎসাহিত না হয়ে বললাম, "ভেতরে লেখা থাকবে, বাঙালি মহিলার যুগান্তকারী আবিষ্কারের কারণে এখন মানুষের অনুভূতি হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারে তার অন্যতম সহযোগী বিজ্ঞানের জন্যে নিবেদিত প্রাণ, নিঃস্বার্থ, জনদরদি, সাহসী, অকুতোভয়, স্বেচ্ছাসেবক মুহম্মদ জাফর ইকবাল!"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "আপনার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে। খবরের কাগজে [illegible] মেয়ে-দেয়ে কাজ নেই– এইসব খবর ছাপবে! [illegible] তাহলে হয়তো ছাপাত!"

আমি বললাম, "কে জানে, হয়তো খানিকটা সেদ্ধ হয়েছে।"

সায়রা উদাস মুখে বলল, "হয়তো হয়েছে। আপনি যখন থুরথুরে বুড়ো হবেন তখন বোঝা যাবে। ততদিনে সেটা তো আর খবর থাকবে না!"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "আপনি যা-ই বলেন না কেন– আমার মনে হয় এটা গরম একটা খবর হতে পারে।"

সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "বিজ্ঞানের আবিষ্কারের খবর, খবরের কাগজে ছাপানোর কথা না– সেটা ছাপানোর কথা জার্নালে!"

কথাটা আমার একেবারেই পছন্দ হলো না, ছোট ছোট টাইপে লেখা খটমটে বিজ্ঞানের ভাষায় লেখা জিনিস জার্নালে ছাপা হলেই কী, আর না হলেই কী? জার্নালে ছাপালে নিশ্চয়ই আমার ছবি ছাপা হবে না। আমি বললাম, "জার্নাল-ফার্নালে না, এটা খবরের কাগজেই ছাপাতে হবে, তার সাথে টেলিভিশনে একটা সাক্ষাৎকার।"

আমি খুব একটা হাস্যকর কথা বলেছি– সেরকম ভান করে সায়রা হি হি করে হাসতে শুরু করল।

আমি অবশ্য হাল ছাড়লাম না, পরদিন থেকে কাজে লেগে গেলাম।

প্রথমে যে খবরের কাগজের সম্পাদক আমার সাথে দেখা করতে রাজি হলেন তাকে দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম– মাথায় বিশাল পাগড়ি এবং প্রায় দেড়ফুট লম্বা দাড়ি। দাড়ি একসময় সাদা ছিল, এখন মেহেদি দিয়ে টকটকে লাল। আমি যখন ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে শুরু করলাম, ভদ্রলোক আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "কী বললেন? মহিলা সায়েন্টিস্ট ? নাউজুবিল্লাহ!"

আমি বললাম, "নাউজুবিল্লাহ কেন হবে? মেয়েরা কি সায়েন্টিস্ট হতে পারে না? হাদিসে আছে–"

পুরুষ এবং মহিলার পড়াশোনা নিয়ে হাদিসটা সম্পাদক সাহেব শুনতে রাজি হলেন না। বললেন, "আমাদের পত্রিকা চলে মিডলইস্টের টাকাতে। সেই দেশের মেয়েরা ভোট দিতে পারে না– আর আমি লিখব মহিলা

সায়েন্টিস্টের কথা? আমার রুটি-রুজি বন্ধ করে দেব? আমার মাথা খারাপ হয়েছে?"

কাজেই আমাকে অন্য একটি পত্রিকা অফিসে যেতে হলো। সম্পাদক সাহেব আমার সব কথা শুনে অনেকক্ষণ সরু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "কোন পার্টি?"

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "কোন পার্টি মানে?"

"মানে কোন পার্টি করে? আমাদের এইটা পার্টির পত্রিকা। আমাদের পার্টি না হলে ছাপানো যাবে না–"

"কিন্তু সে তো পার্টি করে না।"

"গুড! আজকেই তাহলে পার্টির মেম্বার হয়ে যেতে বলুন। মহিলা শাখা আছে, তাদের মিটিং মিছিলে যেতে হবে কিন্তু–"

সম্পাদক সাহেব আরো অনেক কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু আমার আর শোনার সাহস হলো না। তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

এর পরের পত্রিকার সম্পাদকের সাথে দেখা করার জন্য অনেক ঘোরাঘুরি করতে হলো। শেষ পর্যন্ত যখন দেখা হলো, ভদ্রলোক আমার কথা শোনার সময় সারাক্ষণ একটা ম্যাচের কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে লাগলেন। আমার কথা শেষ হবার পর বললেন, "ভালো একটা নিউজ হতে পারে।"

আমি উৎসাহ পেয়ে বললাম, "আরো অনেক আবিষ্কার আছে। সব শুনলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন।"

সম্পাদক সাহেব আরেকটা ম্যাচের কাঠি বের করে কান চুলকাতে চুলকাতে বললেন, "তবে আমাদের পত্রিকা তো ট্যাবলয়েড, আমরা একটু রগরগে জিনিস ছাপাতে পছন্দ করি। পাবলিক ভালো খায়, পত্রিকা বেশি বিক্রি হয়।"

"রগরগে?"

"হ্যাঁ। নিউজটা ইন্টারেস্টিং করার জন্যে খবরটা একটু রগরগে করতে হবে। কিছু স্ক্যান্ডাল ঢোকাতে হবে।"

আমি অবাক হয়ে মুখ হা করে বললাম, "স্ক্যান্ডাল?"

"হ্যাঁ। খুঁজলেই পাওয়া যায়।" ভদ্রলোক কান চুলকানো বন্ধ করে খুব মনোযোগ দিয়ে ম্যাচের কাঠিটা পর্যবেক্ষণ করে বললেন, "আর না থাকলে ক্ষতি কী? আমরা বানিয়ে বসিয়ে দেব। পাবলিক কপ কপ করে খাবে।"

পত্রিকার খবর আমি এতদিন পড়ার জিনিস বলে জানতাম, এখানে এসে শুনছি সেটা খাবার জিনিস। আরো নতুন জিনিস শেখার একটা [illegible] বানানো নিয়ে সম্পাদক সাহেবের উৎসাহ দেখে [illegible]

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

এর পরে অনেক খোঁজ-খবর করে যে পত্রিকা অফিসে গেলাম সেটার নাম 'দৈনিক মোমের আলো'। এই পত্রিকায় আমার একটা চিঠি ছাপা হয়েছিল বলে আমার ধারণা পত্রিকার উপর আমার একটু দাবিও আছে। সম্পাদক সাহেব খুব ব্যস্ত– আমি কথা শুরু করতেই বললেন, "বিজ্ঞানের আবিষ্কারের উপর খবর?"

"হ্যাঁ। খুব সাংঘাতিক আবিষ্কার–"

সম্পাদক সাহেব হা হা করে হেসে বললেন, "আমি তো বিজ্ঞানের 'ব'-ও জানি না, তাই আবিষ্কারের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝব না। তবে–"

"তবে কী?"

"আমাদের বিজ্ঞানের পাতা দেখার জন্যে আমরা ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসরের সাথে যোগাযোগ রাখি। সেই প্রফেসর এইসব ব্যাপারগুলো দেখে দেন। সবচে' ভালো হয় আপনি যদি আগে এই প্রফেসরের সাথে দেখা করেন।"

"কী নাম প্রফেসরের?"

"প্রফেসর এম.জি. আলী।"

আমি প্রফেসর এম.জি. আলীর বাসা ঠিকানা নিয়ে এলাম– তার ভালো নাম মোল্লা গজনফর আলী। ইউনিভার্সিটির মাস্টার কিন্তু মনে হলো ঢাকা শহরের সব স্কুল-কলেজ-ট্রেনিং সেন্টারে পড়ান। অনেক কষ্ট করে তাকে একদিন টেলিফোনে ধরতে পারলাম। কী জন্যে ফোন করেছি বলার পর গজনফর আলী বললেন, "বুঝতেই পারছেন, মোমের আলো– এতো বড় একটা পত্রিকা তো আর সোজা ব্যাপার না, ইচ্ছা করলেই তো সেখানে কিছু ছাপানো যায় না। আমার কথায় কাজ হয়–"

আমি বিনয় করে বললাম, "সেই জন্যই তো আপনার কাছে ফোন করেছি।"

গজনফর আলী বললেন, "ফোনে কি আর কাজ হয়? পত্রিকায় ছাপা হলে ন্যাশনাল ব্যাপার হয়ে যায়। বিজনেস কমিউনিটি ইন্টারেস্ট দেখায়– লাখ লাখ টাকার ট্রানজেকশন হতে পারে– হে হে হে–"

বাক্য শেষ না করে হঠাৎ করে তিনি কেন হাসলেন বুঝতে পারলাম না। বললাম, "আবিষ্কারটা আমি নিয়ে আসব?"

"আবিষ্কার কি নিয়ে আসার জিনিস? যেটা আনলে কাজ হবে সেটা [illegible] মোটা এনভেলাপ। হে হে হে–"

গজনফর আলী কেন এনভেলপের কথা বললেন আর আবার কেন হাসলেন আমি বুঝেতে পারলাম না। বললাম, "যিনি আবিষ্কার করেছেন তাকে সহ নিয়ে আসব?"

"আপনি মনে হয় বুঝতে পারছেন না।" গজনফর আলী একটু অধৈর্য হয়ে বললেন, "আমি আপনাকে দেখব। আপনি আমাকে দেখবেন। এইটা দুনিয়ার নিয়ম। বুঝেছেন?"

"জি জি বুঝেছি। আমি কালকেই আপনার বাসায় চলে আসব– তখন আপনি আমাকে দেখবেন আমিও আপনাকে দেখব। সামনা সামনি দেখে পরিচয় হবে।"

ঠিক বুঝতে পারলাম না কেন জানি গজনফর আলী হঠাৎ করে আমার উপর খুব বিরক্ত হয়ে উঠলেন। আমি অবশ্যি কিছু মনে করলাম না– গরজটা যখন আমার কিছু তো সহ্য করতেই হবে! মোল্লা গজনফর আলীকে যদি নরম করতে পারি তাহলেই পত্রিকায় একটা ছবি ছাপানো যাবে। সারা জীবনের সখ পত্রিকায় একটা ছবি ছাপানো– কাজেই আমি তার বিরক্তিটা হজম করে নিলাম।

তবে ঝামেলাটা হলো সম্পূর্ণ অন্য জায়গায়– সায়রা বেঁকে বসল। মাথা নেড়ে বলল, "আমি কোথাও যেতে পারব না।"

"না গেলে কেমন করে হবে? পত্রিকায় একটা নিউজ করতে চাইলে একটু কষ্ট করতে হবে না?"

"আমি কি খুন করেছি না মার্ডার করেছি যে পত্রিকায় নিউজ হতে হবে?"

"কী বলছেন আপনি?" আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম, "এই একটা সুযোগ, পত্রিকায় আপনার সাথে আমার একটা ছবি ছাপা হতো– দশজনকে দেখাতাম।"

সায়রা মুচকি হেসে বলল, "আপনার যখন এতো সখ ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর নিয়ে আনি চলে যান।"

"আমি?" সায়রা ঠাট্টা করছে কি-না আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, বললাম, "আমি যন্ত্রটার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারি না– আর আমি সেটা নিয়ে যাব?"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

"আপনাকে আমি সব শিখিয়ে দিচ্ছি। কেমন করে চালায় সেটাও শিখিয়ে দেব।"

"আমি এখনো নিজে নিজে টেলিভিশন চালাতে পারি না–"

সায়রা হেসে বলল, "ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর চালানো টেলিভিশন চালানো থেকে সোজা!"

যন্ত্রপাতিকে আমি খুব ভয় পাই– কিছুতেই আমি রাজি হতাম না, কিন্তু পত্রিকায় ছবি ছাপা হবে ব্যাপারটা আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলাম।

গজনফর আলীর বাসার বাইরে থেকেই ভেতরে একটা তুলকালাম কাণ্ড হচ্ছে বলে মনে হলো, একজন মহিলা খনখনে গলায় বলল, "তোমার সাথে বিয়ে হয়ে আমার জীবন বরবাদ হয়ে গেছে। আমার বাবা যদি হাত-পা বেঁধে পানিতে ফেলে দিত তাহলেই আমি ভালো থাকতাম।"

শুনতে পেলাম গজনফর আলী বলছেন, "তোমাকে না করেছে কে? হাত-পা বেঁধে এখন নদীতে লাফাও না কেন? আমার জানে তাহলে পানি আসে।"

"কী? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? তুমি জান আমার বাবার ড্রাইভারের বেতন তোমার থেকে বেশি?"

গজনফর আলী বললেন, "শুধু বেতন কেন? সবকিছুই তো বেশি।"

মহিলা খনখনে গলায় বললেন, "কী বলতে চাইছ তুমি?"

"বলতে চাইছি যে তোমার মায়ের ওজন চিড়িয়াখানার হাতির ওজনের থেকে বেশি। তোমার ওজন–"

গজনফর আলী কথা শেষ করতে পারলেন না– মনে হলো তাকে কিছু একটা আঘাত করল। আরো বেশি সময় অপেক্ষা করলে অবস্থা আরো খারাপ হতে পারে তাই আমি কলিং বেলটা চেপে ধরলাম। ভেতরে হৈচৈ এবং তুলকালাম কাণ্ড হঠাৎ করে থেমে গেলো। গজনফর আলী নাকি গলায় বললেন, "কে?"

"আমি।"

"আমি কে?"

"ঐ যে কালকে যে আবিষ্কার নিয়ে কথা বলেছিলাম– সেটা নিয়ে এসেছি।"

[illegible] কেউ গজগজ করে নিচু স্বরে কথা বলল, তারপর দরজা খুলে দিল। প্রফেসর গজনফর আলী একটা রুমাল দিয়ে নাক চেপে দাঁড়িয়ে আছেন। নাকের উপর একটা আঘাত এসেছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। পাশের ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই তার স্ত্রী– সাইজে গজনফর আলীর দ্বিগুণ। ভদ্রলোকের সাহস আছে মানতে হয়, তা না হলে কেউ এরকম একজন স্ত্রীর সাথে এভাবে ঝগড়া করে?

গজনফর আলী রুমাল দিয়ে নাক চেপে ধরে নাকি গলায় বললেন, "যেটা আনতে বলেছি সেটা এনেছেন?"

"না, মানে ইয়ে– সায়েন্টিস্ট? তিনি আসতে রাজি হলেন না, আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

গজনফর আলী খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমি কী সায়েন্টিস্টের কথা বলেছি? আমি এনভেলাপের কথা বলছি। আপনাদের দিয়ে কোনো কাজ হবে না, শুধু শুধু আমাদের সময় নষ্ট করেন।"

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "একবার এই যন্ত্রটা দেখেন! এটার নাম হচ্ছে ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর–"

আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে গজনফর আলী বললেন, "এটা ছাতা-মাতা যাই হোক আপনি রেখে যান। আমি দেখে নেব।"

"আপনি নিজে নিজে দেখতে পারবেন না। কীভাবে কাজ করে দেখিয়ে দিই।"

গজনফর আলী মুখ বাঁকা করে বললেন, "একটা সিস্টেম কীভাবে কাজ করে সেটা আপনি জানেন না– আর আপনি আমাকে এই যন্ত্র কীভাবে কাজ করে সেটা শিখাবেন?"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেললাম, "আপনাদের ফ্যামিলির জন্যে এটা খুব দরকারি হতে পারত–"

গজনফর আলী নাক থেকে রুমাল সরিয়ে বললেন, "আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?"

"না মানে ইয়ে– বলছিলাম কী, বাইরে থেকে শুনেছিলাম দুইজনে ঝগড়া করছিলেন।"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

এবারে গজনফর আলীর স্ত্রী হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে এক পা এগিয়ে এসে বললেন, "আপনার এতো বড় সাহস? দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের [illegible]"

[illegible] কানের তো সেটা নেই। তাই চোখের পাতি ফেলে দেখা বন্ধ করে ফেলা যায়, কিন্তু শোনা তো বন্ধ করা যায় না–"

"তাই বলে আপনি–"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "কিন্তু এই যন্ত্রটা ব্যবহার করে দেখেন আপনাদের ঝগড়াঝাটি বন্ধ হয়ে যাবে।"

গজনফর আলীর স্ত্রী চোখ ছোট ছোট করে বললেন, "কীভাবে সেটা সম্ভব হবে?" তিনি গজনফর আলীকে দেখিয়ে বললেন, "এই চামচিকে যে বাসায় থাকে সেই বাসায় কি ঝগড়াঝাটি বন্ধ হতে পারে?"

গজনফর আলী হাত নেড়ে বললেন, "মুখ সামলে কথা বলো, না হলে কিন্তু খুনোখুনি হয়ে যাবে–"

"কী? তুমি আমাকে খুন করবে? তোমার এতো বড় সাহস?"

আবার দুজনের মধ্যে একটা হাতাহাতি শুরু হতে যাচ্ছিল, আমি কোনো মতে থামালাম। বললাম, "ঝগড়া না করে এই যন্ত্রটা ব্যবহার করে দেখেন।"

গজনফর আলীর স্ত্রী বললেন, "কী হবে এই যন্ত্রটা ব্যবহার করলে?"

আমি রিমোট কন্ট্রোলের মতো জিনিসটা দেখিয়ে বললাম, "এই যে দেখছেন এখানে লেখা আছে 'ভালোবাসা'– এই বোতামটা টিপলেই আপনার হাজব্যান্ডের জন্যে ভালোবাসা হবে।"

"বোতাম টিপলেই?"

"আগে যন্ত্রটার পাওয়ার অন করে এই হেলমেটটা পরে নিতে হবে।"

"তাহলেই এই চামচিকার জন্যে আমার ভালোবাসা হবে?"

"হ্যাঁ।"

তারপরে যে ঘটনাটা ঘটল আমি সেটার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। হঠাৎ করে ভদ্রমহিলা হি হি করে হাসতে হাসতে একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। হাসতে হাসতে প্রথমে তার চোখে পানি এসে গেলো এবং শেষের দিকে তার হেঁচকি উঠতে লাগল। কোনোমতে বললেন, "এই চামচিকার জন্যে ভালোবাসা? যাকে দেখলেই মনে হয় ছারপোকার মতো টিপে মেরে

ফেলি, তার জন্যে ভালোবাসা? যার চেহারাটা ছুচোর মতো, স্বভাবটা চিকার মতো– তার জন্যে ভালোবাসা? হি হি হি।"

আমি কী করব বুঝতে পারলাম না, বলা যেতে পারে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। গজনফর আলীর স্ত্রী হাসতে হাসতে মনে হয় এক সময় ক্লান্ত হয়ে সোফার মাঝে বসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠিক আছে! লাগান আমার মাথায়, দেখি এটা কী করে?"

গজনফর আলী খুব রাগ রাগ চোখে আমার দিকে আর তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তার মাঝেই ভয়ে ভয়ে যন্ত্রটার সুইচ অন করে হেলমেটটা গজনফর আলীর স্ত্রীর মাথায় পরিয়ে দিলাম। তারপর কন্ট্রোলটা হাতে নিয়ে হালকাভাবে 'ভালোবাসা' বোতামটিতে চাপ দিলাম।

এতক্ষণ গজনফর আলীর স্ত্রীর মুখে এক ধরনের তাচ্ছিল্য আর ঘৃণার ভাব ছিল, বোতামটা টিপতেই সেটা সরে গিয়ে তার মুখটা কেমন জানি নরম হয়ে গেলো। গজনফর আলীও তার স্ত্রীর নরম মুখটা দেখে কেমন জানি অবাক হয়ে গেলেন।

আমি বোতামটা আরো একটু চাপ দিয়ে মস্তিষ্কে স্টিমুলেশান আরেকটু বাড়িয়ে দিলাম, সাথে সাথে গজনফরের স্ত্রীর গলা দিয়ে বাঁশির মতো এক ধরনের সুর বের হলো, তিনি তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওগো! তুমি ওরকম মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমার পাশে এসে বসো।"

স্ত্রীর গলার স্বর শুনে গজনফর আলী একেবারে হকচকিয়ে গেলেন, কেমন জানি ভয়ের চোখে একবার আমার দিকে আরেকবার তার স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তার স্ত্রীর চোখ তখন কেমন জানি ঢুলুঢুলু হয়ে এসেছে, একরকম মায়া মায়া গলায় বললেন, "ওগো! তোমার সাথে আমি কতো খারাপ ব্যবহার করেছি। কতো নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও গো!"

আমি সুইচ টিপে পাওয়ার আরেকটু বাড়াতেই গজনফর আলীর স্ত্রীর গলা দিয়ে একেবারে মধু ঝরতে লাগল, "ওগো গজু। ওগো সোনামণি। ওগো আমার আকাশের চাঁদ– আমি কতো নিষ্ঠুরের মতোন তোমার নাকে ঘুসি মেরেছি। আমার হৃদয়ের টুকরোর উপর কেমন করে এই অত্যাচার আমি করতে পারলাম! হাবিয়া দোজখেও তো আমার জায়গা হবে না। আমি কোথায় যাব গো গজু! আমার কী হবে গো গজু!"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

[illegible] ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ করে কাঁদতে লাগলেন, কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "[illegible] তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ? বলো গো সোনার টুকরা। চাঁদের খনি। তুমি বলো, তা না হলে আমি তোমার পায়ে মাথা ঠুকে আত্মঘাতী হব। এই জীবন আমি রাখব না– কিছুতেই রাখব না–"

গজনফর আলীর স্ত্রী সত্যি সত্যি সোফা থেকে উঠে তার স্বামীর পায়ের উপর আছড়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি সুইচ থেকে হাত সারিয়ে স্টিমুলেশান বন্ধ করে দিলাম।

গজনফর আলীর স্ত্রী কেমন জানি ভ্যাবাচেকা মেরে সোফায় বসে রইলেন। একবার আমার দিকে তাকান, একবার ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর যন্ত্রের দিকে, আরেকবার তার স্বামী গজনফর আলীর দিকে তাকান। অনেকক্ষণ পর ফিস ফিস করে বললেন, "কী আশ্চর্য! কী আচানক ব্যাপার।"

আমি তখন মোটামুটি যুদ্ধজয়ের ভঙ্গি করে গজনফর আলীর দিকে তাকিয়ে বললাম, "দেখেছেন? এটার নাম হচ্ছে ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর।" সায়রা যেসব জিনিস মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিল, সেগুলি মুখস্ত বলতে শুরু করলাম। "মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট জায়গায় উচ্চ কম্পনের চৌম্বকীয় তরঙ্গ দিয়ে এটার স্টিমুলেশন দেয়া হয়। স্টিমুলেশান দিয়ে একেক রকম অনুভূতি জাগিয়ে তোলা যায়। যেমন মনে করেন–"

গজনফর আলী আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "এটা কে তৈরি করেছে?"

"একজন মহিলা সায়েন্টিস্ট– তার নাম হচ্ছে সায়রা সায়েন্টিস্ট।"

গজনফর আলী খুব তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে আর যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "কী কী অনুভূতি তৈরি করা যায়?"

আমি রিমোট কন্ট্রোলের মতো যন্ত্রটা দেখিয়ে বললাম, "এই যে দেখেন, এখানে সব লেখা আছে। হাসি কান্না ভালোবাসা থেকে শুরু করে রাগ, দুঃখ ভয় সবকিছু।" আমি তারপর গজনফর আলীকে সাবধান করে দিয়ে বললাম, রাগ দুঃখ ভয় এইসব অনুভূতি থেকে খুব সাবধানে থাকতে– বিপদ হয়ে যেতে পারে। গজনফর আলী খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনে বললেন, "এটা কেমন করে চালায়?"

আমি গজনফর আলীকে ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর চালানোটা শিখিয়ে দিলাম। গজনফর আলীর চোখ কেমন জানি চকচক করতে লাগল, একটা

নিঃশ্বাস আটকে রেখে বললেন, "ঠিক আছে জাফর ইকবাল সাহেব, আপনার যন্ত্রটা আপনি আজকে রেখে যান, আমি দেখি। কালকে আপনি একবার আসেন, তখন ঠিক করা যাবে এটা নিয়ে কী ধরনের রিপোর্ট লেখা যায়।"

সায়রা সায়েন্টিস্টের তৈরি এই যন্ত্রটা আমার একেবারেই রেখে যাওয়ার ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু আমি না করতে পারলাম না। এই মানুষটা না বলা পর্যন্ত 'দৈনিক মোমের আলো' পত্রিকায় রিপোর্ট ছাপা হবে না– আমার ছবি ছাপা হবে না কাজেই কিছু করার নেই। তবে মোল্লা গজনফর আলী আজকে একেবারে নিজের চোখে এটার কাজ দেখেছেন, কাজেই ভালো একটা রিপোর্ট না লিখে যাবেন কোথায়?

পরের দিন অফিস থেকে একেবারে সোজা গজনফর আলীর বাসায় চলে গেলাম। আজকে আর ভেতরে হৈচৈ হচ্ছে না, আমি তাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কলিং বেল টিপলাম। বেশ কয়েকবার টেপার পর গজনফর আলী দরজা খুললেন। আমাকে দেখে কেমন যেন ভঙ্গি করে বললেন, "কাকে চান?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "আমাকে চিনতে পারছেন না? গতকাল ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর নিয়ে এসেছিলাম!"

"ও! ও!" হঠাৎ মনে পড়েছে সেরকম ভান করে বললেন, "ঐ যে খেলনাটা নিয়ে এলেন!"

"খেলনা?" আমি প্রায় আর্তনাদ করে বললাম, "খেলনা কী বলছেন? যুগান্তকারী আবিষ্কার।"

গজনফর আলী মুখ বাঁকা করে হেসে বললেন, "আপনাদের নিয়ে এই হচ্ছে সমস্যা! কোনটা আবিষ্কার আর কোনটা খেলনা তার পার্থক্য ধরতে পারেন না।"

"কী বলছেন আপনি?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "আপনার স্ত্রীর মাথায় লাগিয়ে পরীক্ষা করলাম আমরা, মনে নাই? আপনাকে ভালোবেসে গজু বলে ডাকলেন–"

গজনফর আলী হাত নেড়ে বললেন, "ঠাট্টা সব ঠাট্টা। আমার স্ত্রী খুব রসিক, সে ঠাট্টা করছিল, আমাকে বলেছে।"

"অসম্ভব!" আমি গলা উঁচিয়ে বললাম, "হতেই পারে না।"

গজনফর আলী চোখ পাকিয়ে বললেন, "আপনি আমার বাসায় এসে আমার উপর গলাবাজি করছেন, আপনার সাহস তো কম নয়।"

আমি গলা আরো উঁচু করে বললাম, "আপনি আমার সাথে মিথ্যা কথা বলবেন আর আমি সেটা সহ্য করব?"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

[illegible] গলায় বললেন, "আপনি চলে যাবার পর আপনার [illegible] আমি এক ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করেছি। কোনো কাজ করে না। মাঝে মাঝে হালকা টুং টাং শব্দ শোনা যায়। উল্টো হেলমেটের সাইডে ধারালো একটা জিনিসে ঘষা লেগে আমার গাল কেটে গেছে। এই দেখেন...।" গজনফর আলী তার গালে একটা কাটা দাগ দেখালেন।

আমি বললাম, "মিথ্যা কথা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে শেভ করতে গিয়ে কেটেছে।"

"শেভ কীভাবে করতে হয় আমি জানি। আপনার জন্মের আগে থেকে আমি শেভ করি।" গজনফর আলী চোখ পাকিয়ে বললেন, "এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে একটা ভাওতাবাজী। মানুষকে ঠকানোর একটা বুদ্ধি। আপনাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কেস করা উচিত। চারশ' বিশ ধারার কেস।"

রাগে আমার মাথা গরম হয়ে উঠল, ইচ্ছে করল গজনফর আলীর নাকে ঘুসি মেরে চ্যাপ্টা নাকটা আরো চ্যাপ্টা করে দিই। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে বললাম, "ভাওতাবাজী কে করছে আমি খুব ভালো করে জানি।"

"জানলে তো ভালোই।" গজনফর আলী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি আমার অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছেন।"

"ঠিক আছে আর সময় নষ্ট করব না। আমি যাচ্ছি। আমার ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটরটা দেন।"

গজনফর আলী হাত নেড়ে বললেন, "আপনার ঐ যন্ত্র নিয়ে আমি বসে আছি নাকি?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "মানে?"

"আমার বাসায় আপনাদের সব জঞ্জাল ফেলে রাখবেন আর আমি সেটা সহ্য করব?"

গজনফর আলী কী বলছেন আমি তখনো বুঝতে পারলাম না, অবাক হয়ে বললাম, "কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।"

"বলছি যে আপনার ঐ জঞ্জাল আমি ফেলে দিয়েছি।"

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না, রীতিমতো আর্তনাদ করে বললাম, "ফেলে দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না, কয়েকবার চেষ্টা করে বললাম, "কোথায় ফেলে দিয়েছেন?"

"বাসার সামনে ময়লা ফেলার জায়গায়।"

আমি রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে বললাম, "আপনি আমাদের জিনিস ফেলে দিলেন মানে?"

"আপনাদের জিনিস কে বলেছে? আপনি গতকাল আমাকে দিয়ে গেলেন না?"

"দেখতে দিয়েছি। ফেলে দিতে তো দেইনি।"

গজনফর আলী চোখ ছোট ছোট করে বলল, "আপনি কী জন্যে দিয়েছেন সেটা তো আর আমার জানার কথা না। আপনার কাজ আপনি করেছেন, আমার কাজ আমি করেছি। আবর্জনা ফেলে দিয়েছি।"

আমি এতো খেপে গেলাম যে সেটা আর বলার কথা নয়। এই লোকটা– যে নাকি ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর, যে এরকম চোখের উপর ডাহা একটা মিথ্যা কথা বলতে পারে আমি নিজের চোখে না দেখলে কখনো বিশ্বাস করতাম না। সায়রার এই সাংঘাতিক আবিষ্কারটা সে চুরি করেছে। চুরি না বলে বলা উচিত ডাকাতি। একেবারে দিন দুপুরে ডাকাতি। আমি কী করব বুঝতে না পেরে বললাম, "আপনার নামে আমি কেস করব। থানায় জিডি করব।"

গজনফর আলী খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বললেন, "করেন গিয়ে, তখন টের পাবেন কতো ধানে কতো চাল! পুলিশের লোকেরা কাউকে ভয় পায় না, শুধু খবরের কাগজকে ভয় পায়। আমি হচ্ছি সেই খবরের কাগজের লোক। এই টেলিফোন দিয়ে আমি একটা ফোন করব, আর আপনি থানায় যাওয়ামাত্র আপনাকে ক্যাঁক করে এরেস্ট করে হাজতে নিয়ে যাবে। তারপর শুরু হবে রিমান্ড। রিমান্ড কী জিনিস আপনি জানেন?"

"এটা কি মগের মুল্লুক নাকি?"

গজনফর আলী মুখে মধুর একটা হাসি ফুটিয়ে বললেন, "আপনি মনে হয় খবরের কাগজ পড়েন না, তাই দেশের অবস্থা জানেন না। দেশের অবস্থা এখন মগের মুল্লুক থেকে খারাপ। হে হে হে।"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। গজনফর আলী গলার স্বর নরম করে বললেন, "আপনাকে একটা উপদেশ দেই। এটা নিয়ে কোনো

তেড়িবেড়ি করবেন না, তাহলে অবস্থা খারাপ হবে। প্রথমে আপনাকে নিয়ে আর সেই মহিলা সায়েন্টিস্টকে নিয়ে পত্রিকায় জঘন্য জঘন্য রিপোর্ট বের হবে। তাতেও যদি শান্ত না হন আমার অন্য ব্যবস্থা আছে।"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

"অন্য কী ব্যবস্থা?"

"গাল কাটা বক্করের নাম শুনেছেন?"

আমি শুকনো গলায় বললাম, "শুনেছি।"

"সাতাশটা কেইস আছে, তার মাঝে বারোটা মার্ডার কেস। পুলিশের বাবার সাধ্য নাই তাকে ধরে। সবার নাকের ডগা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে গাল কাটা বক্করের?"

"আমার কথায় উঠে বসে। আমার মোবাইলে নম্বর ঢোকানো আছে। খালি একটা মিস কল দিব, ব্যস–।" গজনফর আলী হাত দিয়ে গলায় পোচ দেবার একটা ভঙ্গি করলেন। আমি অবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সায়রা যখন শুনবে তার এই ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর প্রফেসর গজনফর আলী চুরি করে রেখে দিয়েছে– তখন কী করবে সেটা চিন্তা করে আমার পেটের ভাত একেবারে চাল হয়ে গেলো। খুব দুশ্চিন্তা নিয়ে আমি তাকে খবরটা দিতে গেলাম। কিন্তু সায়রা দেখলাম ব্যাপারটার কোনো গুরুত্বই দিল না। গজনফর আলীর পাহাড়ের মতো স্ত্রী 'গজু' বলে মধুর গলায় ডাকছিল সেই অংশটা শুনে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "আপনি হাসছেন? দিন দুপুরে এরকম ডাকাতি করল আর আপনি সেটা শুনে হাসছেন?"

"ছোট একটা যন্ত্র চুরি করে রেখেছে, রাখতে দিন! বউয়ের ভালোবাসার জন্যে করেছে– আহা বেচারা!"

আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, "কাকে আপনি বেচারা বলছেন? গজনফর আলী কতো বড় বদমাশ আপনি জানেন? এই লোকের একশ' বছর জেল হওয়া উচিত!"

সায়রা একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সোসাইটিতে সবাই যদি এক রকম হয় তাহলে লাইফটা বোরিং হয়ে যাবে। এই জন্যে কাউকে হতে হয় ভালো, কাউকে খারাপ আর কাউকে হতে হয় গজনফর আলীর মতো বদমাশ!"

আমি অবাক হয়ে সায়রার দিকে তাকিয়ে রইলাম, সায়রা যদি বিজ্ঞানীর সাথে সাথে দার্শনিক হতে শুরু করে তাহলে তো মহাবিপদ হয়ে যাবে। আমি বললাম, "কিন্তু আপনার এতো মূল্যবান একটা যন্ত্র–"

"[illegible]! কয়টা কয়েল, একটা পুরনো পাওয়ার সাপ্লাই, একটা সস্তা হেলমেট– সব মিলিয়ে দুই হাজার টাকার জিনিস আছে কি-না সন্দেহ!"

"কিন্তু আপনার পরিশ্রম?"

"কে বলেছে পরিশ্রম! এসব কাজ করতে আমার ভালো লাগে, কোনো পরিশ্রম হয় না।"

"তাই বলে ঐ বদমাশ গজনফর আলী এতো সুন্দর একটা জিনিস নিয়ে যাবে?"

"আপনি চিন্তা করবেন না। ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর কীভাবে তৈরি করতে হয় আমি জানি। দরকার হলে আমি ডজন ডজন তৈরি করে দেব।"

"কিন্তু একটা মানুষ এতো বড় অন্যায় করে পার পেয়ে যাবে? কোনো শাস্তি পাবে না?"

"অন্যায়? শাস্তি?" হঠাৎ করে সায়রা অন্যমনস্ক হয়ে কী একটা ভাবতে লাগল। আমি সায়রার দিকে তাকালাম। সে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে, কিন্তু আমাকে দেখছে না! গভীর কোনো একটা চিন্তায় ডুবে গেছে।

বিজ্ঞানীরা যখন গভীর চিন্তায় ডুবে যায় তখন তাদের ঘাঁটানো ঠিক নয়, তাই তাকে বিরক্ত না করে আমি চলে এলাম।

কয়েক সপ্তাহ পরের কথা, 'দৈনিক মোমের আলো' পত্রিকার সাহিত্য পাতায় দেখি একটি কবিতা ছাপা হয়েছে। কবিতার নাম 'তোমাকে স্পর্শ করি' এবং কবিতাটি লিখেছেন মোল্লা গজনফর আলী। দেখে আমি রীতিমতো আঁতকে উঠলাম– মোল্লা গজনফর আলীর মতো মানুষ কবিতা লিখে ফেলেছে? সেই কবিতা আবার ছাপাও হয়েছে? আমি কবিতাটি পড়ার চেষ্টা করলাম, শুরু হয়েছে এভাবে–

"বুকের ভেতর খেলা করে আমার সকল বোধ
তোমাকে স্পর্শ করি–"

কবিতাটি পড়ে আমার কোনো সন্দেহই থাকল না যে আসলে এই বদমাশ মানুষটা সায়রার ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর ব্যবহার করে কবিতাটা

লিখে ফেলেছে। রাগে আমার ব্লাড প্রেসার বেড়ে গেলো কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। কিছু করার চেষ্টা করলে মোল্লা গজনফর আলী নিশ্চয়ই গাল কাটা বন্দুক কাটা রাইফেল দিয়ে আমার বাসায় পাঠিয়ে দেবে।

http://www.adultpdf.com
Created by ImageTo PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

[illegible] বইমেলায় মোল্লা গজনফর আলীর একটা কবিতার বই বের হয়েছে, বইয়ের নাম 'অনুভূতির চেনা বাতাস'। শুধু যে বের হয়েছে তা নয়, বই নাকি একেবারে মার মার কাট কাট করে বিক্রি হচ্ছে। 'দৈনিক মোমের আলো'র শেষ পৃষ্ঠায় ছবি বের হলো– মোল্লা গজনফর আলী পাঞ্জাবি পরে বইয়ে অটোগ্রাফ দিচ্ছে আর তার চারপাশে কমবয়সী মেয়েরা ভিড় করে আছে।

বইমেলার শেষের দিকে বিশেষ বই নিয়ে আলোচনা বের হলো, সেখানে 'অনুভূতির চেনা বাতাস' বইয়ের উপর বিশাল আলোচনা। লেখা হয়েছে, "আমাদের কাব্য অঙ্গনের স্থবিরতা দূর করতে যে মানুষটি প্রায় হঠাৎ করে উপস্থিত হয়েছেন তার নাম মোল্লা গজনফর আলী। কবিতার জগতে তার পদচারণা ফাল্গুনের ঝড়ো হাওয়ার মতো– সাহসী এবং বিক্ষুব্ধ।..."

আমি শেষ পর্যন্ত পড়তে পারলাম না, খবরের কাগজটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলাম।

মাসখানেক পর নীলক্ষেত থেকে রিকশা করে আসছি, আর্ট ইনস্টিটিউটের সামনে দেখি মানুষের ভিড়। সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড় পরা মানুষজন গাড়ি থেকে নামছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি গেটের পাশে ফেস্টুন, বড় বড় করে লেখা–

'মোল্লা গজনফর আলীর একক চিত্রপ্রদর্শনী।'

আমি রিকশায় বজ্রাহতের মতো বসে রইলাম। রাগে-দুঃখে ঐ এলাকা দিয়েই হাঁটা চলা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু তাতে কি আর রক্ষা আছে? একদিন টেলিভিশন দেখছি, হঠাৎ দেখি টেলিভিশনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে এক উপস্থাপিকা মোল্লা গজনফর আলীকে নিয়ে এসেছে। দেখলাম তাকে জিজ্ঞেস করছে, "আপনি বিজ্ঞানের প্রফেসর, হঠাৎ করে কবিতা এবং ছবি আঁকায় উৎসাহী হলেন কেন?"

মোল্লা গজনফর আলী হাত দিয়ে মাথার এলোমেলো চুলকে সোজা করতে করতে বললেন, "আসলে সৃজনশীলতা একটি অনুভবের ব্যাপার।

আমার হঠাৎ করে মনে হলো, সারা জীবন তো বিজ্ঞানের সেবা করেছি– সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির অন্য মাধ্যমগুলোয় একটু পদচারণা করে দেখি।"

উপস্থাপিকা ন্যাকা ন্যাকা গলার স্বরে ঢং করে বলল, "কিন্তু আপনার পদচারণা তো ভীরু পদচারণা নয়, সাহসী পদচারণা, দৃপ্ত পদচারণা–"

মোল্লা গজনফর আলী স্মিত হেসে বলল, "প্রতিভার ব্যাপারটি তো আসলে নিয়ম-কানুন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না–"

এই পর্যায়ে আমি লাথি দিয়ে আমার টেলিভিশনটা ফেলে দিলাম, সেটা উল্টে পড়ে ভেতরে কী একটা ঘটে গেলো, বিকট একটা শব্দ হলো এবং কালো ধোঁয়া বের হতে লাগল।

মোল্লা গজনফর আলী যখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা সিডি বের করে ফেলল, তখন ব্যাপারটা আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, সায়রার কাছে গিয়ে নালিশ করলাম।

পুরো ব্যাপারটা শুনে সায়রা হেসে কুটি কুটি হয়ে বলল, "আপনি এতো রেগে যাচ্ছেন কেন?"

"রাগব না? এই বেটা বদমাশ শুধু যে আপনার যন্ত্র চুরি করল তাই নয়, এখন সেটা ব্যবহার করে কবি হয়েছে, আর্টিস্ট হয়েছে– এখন গায়ক হচ্ছে!"

"হলে ক্ষতি কী?"

"কোনো ক্ষতি নাই?"

"না।"

"আমিও তো গজনফর আলীর মতো কবি, শিল্পী আর গায়ক হতে পারতাম– পারতাম না?"

সায়রা আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "উঁহু, আপনি পারতেন না। মানুষকে ঠকানোর জন্যে যে ফিচলে বুদ্ধি দরকার, আপনার সেটা নাই। আপনি হচ্ছেন সাদাসিধে মানুষ।"

কাজেই সায়রাকে কোনোভাবেই কিছু একটা ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে রাজি করানো গেলো না।

যত দিন যেতে লাগল মোল্লা গজনফর আলী ততই বিখ্যাত হতে লাগল। ম্যাগাজিনে তার সাক্ষাৎকার ছাপা হতে লাগল, বিভিন্ন সংগঠন থেকে পুরস্কার

পেতে লাগল। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, যখন দেখলাম, মোল্লা গজনফর আলী প্রধান অতিথি হয়ে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে গিয়ে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের পুরস্কার দিচ্ছে। পুরস্কার দিয়ে তাদেরকে সুনাগরিক হয়ে দেশ এবং সমাজের সেবা করার উপদেশ দিচ্ছে। আমার জীবনের উপর ঘেন্না ধরে গেলো। মনে হতে লাগল, মোল্লা গজনফর আলীকে খুন করে ফাঁসিতে ঝুলে যাই। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হবে না। ব্যাটা বদমাশ তখন 'শহীদ' হয়ে যাবে– তার নামে স্মৃতিসৌধ তৈরি হয়ে যাবে!

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

মোল্লা গজনফর আলীর উৎপাতে যখন দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার কথা চিন্তা-ভাবনা করছি তখন হঠাৎ করে পত্রিকায় একটা খবর ছাপা হলো যেটা দেখে আমার পুরো চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। খবরটি এরকম, উপরে হেডলাইন–

বাঙালি বিজ্ঞানীর যুগান্তকারী আবিষ্কার
মানুষের অনুভূতি এখন হাতের মুঠোয়

তার নিচে ছোট ছোট করে লেখা–

> বাংলাদেশের বিজ্ঞানী– যিনি একাধারে কবি, শিল্পী এবং গায়ক হিসেবে এই দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতির অঙ্গনে সুপরিচিত, তার যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা জাতির সামনে প্রকাশ করছেন। প্রফেসর মোল্লা গজনফর আলী জানিয়েছেন, মানুষের মস্তিষ্কে উচ্চ কম্পনের চৌম্বকীয় তরঙ্গ দিয়ে তাদের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেছেন।
> আগামী মঙ্গলবার স্থানীয় প্রেসক্লাবে তিনি তার আবিষ্কারটি জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন।

পাশেই একটি রঙিন ছবি, মোল্লা গজনফর আলী রিমোট কন্ট্রোলের মতো দেখতে কন্ট্রোলটি হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, পাশে তার স্ত্রী হেলমেটটি মাথায় দিয়ে বসে আছে। দুইজনের মুখেই স্মিত হাসি। নিচে মোল্লা গজনফর আলীর জীবন-বৃত্তান্ত।

খবরটি দেখে আমার মাথার ভেতরে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেলো। আমি তখন তখনই কাগজটা হাতে নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে সায়রার বাসায়

হাজির হলাম। আমাকে এভাবে ছুটে আসতে দেখে সায়রা ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

আমি কাগজটা তার হাতে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, "এই দেখেন!"

সায়রা ছবিটা দেখল এবং খবরটা পড়ল। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলল। আমার বার সে যেরকম পুরো ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, এবারে সেরকম হেসে উড়িয়ে দিল না, তার মুখটা কেমন জানি গম্ভীর হয়ে গেলো। আমি বললাম, "কী হলো?"

"মানুষটাকে শাস্তি দেয়ার একটা সময় হয়েছে। কী বলেন?"

আমি হাতে কিল দিয়ে বললাম, "একশ' বার।"

"ঠিক আছে। মঙ্গলবার দেখা হবে।"

"কোথায় দেখা হবে?"

"প্রেসক্লাবে।"

সায়রা কী করবে সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই, কিন্তু এই মেয়েটার উপরে আমার বিশ্বাস আছে। আমি মঙ্গলবারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম– মনে হতে লাগল ঘন্টা, মিনিট আর সেকেন্ডগুলো এতো আস্তে আস্তে আসছে যে মঙ্গলবার বুঝি কোনোদিন আসবেই না!

প্রেস কনফারেন্সের সময় দেয়া ছিল বিকেল চারটা, আমি তিনটার সময় হাজির হয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি আমি আসার আগেই আরো অনেকে চলে এসেছে। গজনফর আলী আমাকে চিনে ফেলতে পারে বলে আমি একটু পিছনের দিকে বসলাম। আমার পাশের চেয়ারটি সায়রার জন্যে বাঁচিয়ে রাখলাম।

স্টেজটি একটু সাজানো হয়েছে, পেছনে একটা বড় ব্যানার, সেখানে লেখা–

বিজ্ঞানী মোল্লা গজনফর আলীর যুগান্তকারী আবিষ্কার

সামনে একটা টেবিল, সেই টেবিলে সায়রার তৈরি করা ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর যন্ত্রটি। পাশে গদি আটা একটি চেয়ার। সেই চেয়ারের উপর হেলমেটটি সাজানো। গজনফর আলী বলেছিল সে নাকি এগুলোকে আবর্জনা হিসেবে ফেলে দিয়েছিল।

সায়রা এলো ঠিক সাড়ে তিনটার সময়।

আমি ভেবেছিলাম হাতে যন্ত্রপাতি বোঝাই একটা ব্যাগ থাকবে, কিন্তু [illegible] কীভাবে সে গজনফর আলীকে শায়েস্তা করবে বুঝতে [illegible] "কী হলো?"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

"কীসের কী হলো?"

"আপনার যন্ত্রপাতি কই?"

"কীসের যন্ত্রপাতি?"

"গজনফর আলীকে শায়েস্তা করার জন্যে?"

সায়রা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, "আমার তাকে শায়েস্তা করতে হবে কে বলেছে?"

"তাহলে কে শায়েস্তা করবে?"

"নিজেই নিজেকে শায়েস্তা করবে!"

মেয়েটা ঠাট্টা করছে কি-না আমি বুঝতে পারলাম না। আমি একটু ভয় নিয়ে সায়রার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ঠিক চারটার সময় মোল্লা গজনফর আলী এসে হাজির হলেন। আজকে চকচকে একটা চকোলেট রঙের স্যুট পরে এসেছেন। সাথে তার স্ত্রী, এমনভাবে সেজেগুজে এসেছেন যে দেখে মনে হয় বারো বছরের খুকি। তারা দুইজন স্টেজে গিয়ে বসলেন। তখন তেইশ-চব্বিশ বছরের একটা মেয়ে মাইকের সামনে গিয়ে প্রেস কনফারেন্সের কাজ শুরু করে দিল। সে প্রথমে একটা লিখিত রিপোর্ট পড়ে শোনাল– সেখানে বর্ণনা করা আছে মোল্লা গজনফর আলী জিনিসটা কেমন করে আবিষ্কার করেছেন, সেটি তার কতো দীর্ঘদিনের সাধনা, এটা দিয়ে পৃথিবীর কী কী মহৎ কাজ করা হবে ইত্যাদি। শুনে আমার সারা শরীর একেবারে তিড়বিড় করে জ্বলতে লাগল।

এরপর গজনফর আলী উঠে দাঁড়ালেন এবং তখন সবার মাঝে একটা মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়ে গেলো। গজনফর আলী মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "উপস্থিত সুধী মহল এবং সাংবাদিকবৃন্দ, আমি নিশ্চিত এতক্ষণে এই রিপোর্টে যা বলা হলো আপনারা তার সবকিছু বিশ্বাস করেননি। আপনাদের জায়গায় থাকলে আমি নিজেও বিশ্বাস করতাম না– এটি কেমন করে সম্ভব, যে অনুভূতিটুকু এতদিন আমরা আমাদের একেবারে নিজস্ব বলে জেনে এসেছি সেটি একটি যন্ত্র দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়? তাহলে মানুষের অস্তিত্বই কি অর্থহীন হয়ে যায় না?"

গজনফর আলী উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না। আপনারা নিজের চোখে দেখুন, তারপর প্রশ্নের উত্তর বের করে নিন।" মোল্লা গজনফর আলী একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, "প্রথমে আমার [illegible] একজন ভলান্টিয়ার। হাসিখুশি ভলান্টিয়ার, যে মনে করে পৃথিবীতে দুঃখ বলে কিছু নেই!"

অন্যেরা হাত তোলার আগেই প্রায় তড়াক করে লাফ দিয়ে একটা হাসিখুশি মেয়ে উঠে দাঁড়াল। গজনফর আলী তাকে স্টেজে ডাকলেন। স্টেজে যাবার পর তাকে গদি আটা চেয়ারে বসিয়ে মাথায় হেলমেটটা পরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার মনের অনুভূতিটি কী?"

"আনন্দের।"

"ভেরি গুড। দেখি আপনি আপনার এই আনন্দের অনুভূতিটি ধরে রাখতে পারেন কি-না।"

গজনফর আলী একটু দূরে দাঁড়িয়ে ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটরের রিমোট কন্ট্রোলের মতো জিনিসের সুইচটা টিপে ধরলেন, দেখতে দেখতে মেয়েটার মুখ একেবারে বিষণ্ন হয়ে গেলো। গজনফর আলী কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– "আপনার এখন কেমন লাগছে?"

"খুব মন খারাপ লাগছে।"

"কেন?"

"জানি না।" মেয়েটা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

গজনফর আলী বিশ্বজয়ের ভঙ্গি করে সবার দিকে তাকালেন এবং উপস্থিত সবাই হাততালি দিতে শুরু করল। গজনফর আলী মাথা নুয়ে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সুইচটা ছেড়ে দিতেই মেয়েটা চোখ মুছে অবাক হয়ে তাকাল। গজনফর আলী তার মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে তার কাছে মাইক্রোফোন নিয়ে বলেন, "আপনি কি উপস্থিত সবাইকে আপনার অভিজ্ঞতাটুকু বলবেন?"

মেয়েটা উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে বলল, "কী আশ্চর্য! একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! আমি বুকের মাঝে আনন্দের অনুভূতি নিয়ে বসে আছি, হঠাৎ কী হলো– একটা গভীর দুঃখ এসে ভর করল। কী গভীর দুঃখ আপনারা চিন্তাও করতে পারবেন না। আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে কাঁদতে শুরু করেছিলাম– আমি জীবনে কখনো কেঁদেছি বলে মনে করতে পারি না। তারপর ম্যাজিকের মতো হঠাৎ করে সেই দুঃখ চলে গেলো। একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

যারা সামনে বসেছিল তারা আবার আনন্দে হাততালি দিতে থাকে। গজনফর আলী হাত তুলে তাদের থামিয়ে বললেন, "এবারে আমার আরেকজন ভলান্টিয়ার দরকার, যে বাঘের বাচ্চার মতো সাহসী। যে কোনো কিছুতে ভয় পায় না।"

গাট্টাগোট্টা টাইপের একজন এবারে উঠে দাঁড়াল। গজনফর আলী তাকে স্টেজে নিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। মাথায় হেলমেটটি পরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি সাহসী?"

মানুষটি দাঁত বের করে হেসে বলল, "হ্যাঁ আমি সাহসী।"

"আমাকে দেখে আপনার কি ভয় লাগছে?"

"নাহ্! কেন ভয় লাগবে?"

"ভেরি গুড। দেখা যাক সত্যি আপনি সাহসী থাকতে পারেন কি-না।"

গজনফর আলী কন্ট্রোলটা নিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে সুইচটা টিপে ধরতেই মানুষটা দুই হাত দুই পা নিজের ভেতরে নিয়ে এসে ভয় পাওয়া গলায় এমন চিৎকার দিল যে উপস্থিত যারা ছিল সবাই চমকে উঠল। গজনফর আলী মানুষটাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি ভয় লাগছে?"

মানুষটা দুই হাত দিয়ে নিজের চোখ ঢেকে একটা বিকট আর্তনাদ করে উঠল। গজনফর আলী সবার দিকে তাকিয়ে এক গাল হেসে সুইচটা ছেড়ে দিয়ে বললেন, "আপনারা সবাই নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন যে, ভয়ের অনুভূতিটি কিন্তু এই যন্ত্র থেকে এসেছে।"

দর্শক এবং সাংবাদিকরা আবার হাততালি দিতে শুরু করে। গজনফর আলী মাইক্রোফোনটা হেলমেট মাথায় মানুষটির হাতে দিয়ে বললেন, "আপনার অনুভূতির কথাটি শুনি?"

মানুষটা তখনো দরদর করে ঘামছে, মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে পাংশু মুখে বলল, "কী ভয়ঙ্কর একটা অভিজ্ঞতা! আমি নিশ্চিত ছিলাম পুরো ব্যাপারটা আসলে বানানো। একেবারেই বিশ্বাস করিনি। চেয়ারে বসেছিলাম হঠাৎ করে এমন একটা অমানুষিক ভয় এসে ভর করল যে ভাষায় সেটার বর্ণনা করা যায় না। মনে হলো এটা অন্ধকার একটা শ্মশান, চারপাশে ভূত-প্রেত, আর বিজ্ঞানী গজনফর আলী একজন দৈত্য!"

খুব মজার একটা রসিকতা হয়েছে এরকম ভান করে গজনফর আলী হা হা করে হাসতে হাসতে বললেন, "আমার মনে হয় এখন নতুন কোনো ভলান্টিয়ার পাওয়া খুব মুশকিল হবে! কাজেই আমিই হবো ভলান্টিয়ার।

এই যন্ত্রটা আমি মাথায় দেব এবং আমার স্ত্রী কন্ট্রোলটা দিয়ে আমার অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন।"

একজন জিজ্ঞেস করল, "আপনার কীসের অনুভূতি?"

গজনফর আলী চেয়ারে বসে মাথায় হেলমেটটা পরে বললেন, "এতক্ষণ আপনাদের যা দেখানো হয়েছে সেটা মজার ব্যাপার হতে পারে, কৌতূহলের ব্যাপার হতে পারে কিন্তু তার কোনো বাস্তব গুরুত্ব নেই। এখন আপনাদের দেখাব কীভাবে এই যন্ত্রটি দিয়ে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটানো যায়। মানুষের ভেতরে গাণিতিক প্রতিভা কীভাবে বের করে নেয়া যায়! আমি একজন সাধারণ মানুষ আপনাদের চোখের সামনে গাণিতিক প্রতিভা হয়ে যাব।"

গজনফর আলী তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "সুইচটা টিপে দাও।"

গজনফর আলীর স্ত্রী কন্ট্রোলটা হাতে নিয়ে ঠিক সুইচটা টিপে ধরলেন। গজনফর আলীর মুখ হঠাৎ করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তিনি বললেন, "আপনারা আমাকে দেখে বুঝতে পারছেন না, কিন্তু আমি হঠাৎ করে একটা গাণিতিক প্রতিভা হয়ে গেছি! আমি ইচ্ছে করলে এখন মুখে মুখে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান সলভ করতে পারি। পাইয়ের গঠন শত ঘর পর্যন্ত বলতে পারি। মুখে মুখে বড় বড় গুণ ভাগ করে ফেলতে পারি।"

সায়রা তার ব্যাগ থেকে কিছু একটা বের করে তার শাড়ির আঁচলে ঢেকে নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, "বাছাধনকে এখন বোঝাব মজা।"

আমিও ফিস ফিস করে বললাম, "কীভাবে?"

"গজনফরের ওয়াইফের কাছে যে কন্ট্রোলটা আছে সেটা এখন জ্যাম করে দিয়ে আমি কন্ট্রোল করব।"

আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী কন্ট্রোল করবেন?"

"আপনি দেখেন।"

গজনফর আলী তখনো বলছে, "আপনারা ইচ্ছে করলে আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। বড় বড় গুণ ভাগ দিতে পারেন, যে কোনো সংখ্যার নামতা জিজ্ঞেস করতে পারেন।"

সামনে বসে থাকা একজন বলল, "ছেচল্লিশের নামতা বলেন দেখি!"

"ছেচল্লিশ তো সোজা।" গজনফর আলী বলতে শুরু করল, "ছেচল্লিশ একে ছেচল্লিশ, ছেচল্লিশ দ্বিগুণে বিরানব্বই, তিন ছেচল্লিশে–"

সায়রা ফিস ফিস করে বললেন, "এই যে, সুইচ টিপে দিলাম।"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

সাথে সাথে গজনফর আলী থেমে গিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। দর্শকদের মাঝে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল, একজন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে থেমে গেলেন কেন?"

গজনফর আলী বললেন, "একটা খুব বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে।"

"কী বিচিত্র ব্যাপার?"

"হঠাৎ করে আমার অংক করার ক্ষমতা চলে গিয়ে অন্য একটা ক্ষমতা এসেছে।"

"কী ক্ষমতা?"

"সত্যি কথা বলার ক্ষমতা। এখন আমি কোনো সত্যি কথা বলতে ভয় পাব না।"

উপস্থিত দর্শক সাংবাদিক সবাই চুপ করে গেলো কিন্তু গজনফর আলী থামলেন না, সামনে বসে থাকা একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যেমন আপনাকে বলতে পারি, আপনি যে দাড়ি রেখেছেন সেটাকে বলে ছাগল দাড়ি, আপনাকে তাই ছাগলের মতো দেখাচ্ছে। আর ঐ যে ডান পাশে বসে আছেন নীল শাড়ি পরে– পাউডার দিয়ে না হয় আপনার কালো রঙকে ঢাকলেন, কিন্তু বোঁচা নাককে সোজা করবেন কীভাবে?"

দর্শকদের মাঝে হঠাৎ একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেলো। একজন সাংবাদিক দাঁড়িয়ে একটু রেগে বলল, "আপনি হঠাৎ করে এরকম আপত্তিকর কথা বলতে শুরু করলেন কেন? আমাদের অপমান করছেন কেন?"

গজনফর আলী একটুও রাগলেন না। হাসি হাসি মুখে বললেন, "আমি মোটেও অপমান করছি না, সত্যি কথা বলছি।"

"তাহলে আপনি নিজের সম্পর্কে কিছু সত্যি কথা বলেন।"

"অবশ্যই বলব। আপনি কি ভাবছেন আমি ভয় পাব? এই যে দেখছেন আমার নাক, এটা এরকম চ্যাপ্টা হয়েছে কেমন করে জানেন?"

দর্শকেরা মাথা নাড়ল, তারা জানে না।

গজনফর আলী বললেন, "আমার স্ত্রীর ঘুষি খেয়ে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার স্ত্রী হচ্ছে একটা গরিলার মতো সাইজের, যখন রেগে উঠে তখন কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, আমাকে পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দেয়!"

সবাই একেবারে বজ্রাহতের মতো চুপ করে রইল। গজনফর আলী থামলেন না, বলতেই থাকলেন, "এরকম গরিলার মতো একটা বউকে আমি কেমন করে কন্ট্রোল করি জানেন?" গজনফর আলী মাথায় টোকা

দিয়ে বললেন, "বুদ্ধি দিয়ে। আপনারা সবাই যেরকম একটু বেকুব টাইপের, হা করে আমার দিকে তাকিয়ে আমার কথা শুনছেন, আমি যেটাই বলছি সেটাই বিশ্বাস করছেন আমি সেরকম না। আমি খানিকটা ধুরন্ধর।"

গজনফর আলী একটু দম নিয়ে বললেন, "এই যে যন্ত্রটা দেখছেন আপনারা তাকিয়ে আছেন, এটা আমি তৈরি করেছি?"

সাংবাদিকেরা এবারে চঞ্চল হয়ে উঠল, কয়েকজন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে তৈরি করেছে?"

"ঠিক জানি না। হাবাগোবা টাইপের একজন মানুষ নিয়ে এসেছিল পত্রিকায় রিপোর্ট করার জন্যে, বলেছিল একটা মহিলা সায়েন্টিস্ট তৈরি করেছে। আমি তাকে ঠকিয়ে রেখে দিয়েছি।"

একজন মেয়ে সাংবাদিক দাঁড়িয়ে বলল, "আপনি এটা আবিষ্কার করেন নাই? এটা আরেকজনের আবিষ্কার?"

"ঠিকই বলেছেন। আমার মেধা খুব কম। চা চামচের এক চামচ থেকে বেশি হবে না। তবে আমার ফিচলে বুদ্ধি অনেক। মানুষ ঠকিয়ে খাই। টাকা-পয়সা নিয়ে পত্রিকায় রিপোর্ট ছাপাই– ব্ল্যাকমেইল করি।"

বয়স্ক একজন সাংবাদিক দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি যে সবার সামনে এগুলো বলছেন আপনার সম্মানের ক্ষতি হবে না?"

"সম্মান থাকলে তো ক্ষতি হবে! আমি একজন চোর। আমার কথা বিশ্বাস না করলে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন। আমি যে কবিতা লিখেছি, ছবি এঁকেছি, গান গেয়েছি সব এই যন্ত্র দিয়ে। আমার নিজের কোনো প্রতিভা নাই!"

গজনফরের স্ত্রী এতক্ষণ চোখ বড় বড় করে এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন, এবারে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুমি কী করছ? সবকিছু বলে দিচ্ছ কেন?"

"আমার কোনো কন্ট্রোল নাই! দেখছ না আমার সত্যি কথা বলার রোগ হয়েছে।"

"না, তুমি আর কিছু বলবে না।" গজনফরের স্ত্রী তার স্বামীর দিকে ছুটে এলেন, তার মুখ চেপে ধরার চেষ্টা করলেন। গজনফর আলী হঠাৎ করে বললেন, "ভয়ের কিছু নেই, সত্যি কথা বলতে কোনো ভয় নেই। তুমিও পারবে।"

"না, খবরদার, চুপ কর।"

"ঠিক আছে তাহলে এই হেলমেটটা পর– তাহলে পারবে।" এবং কেউ কিছু বোঝার আগে গজনফর আলী হেলমেটটা তার স্ত্রীর মাথায় পরিয়ে দিলেন। তার স্ত্রী দুই একবার চোখ ঘুরিয়ে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠিকই বলেছিস, চামচিকার বাচ্চা চামচিকা, তুই হচ্ছিস চোর ডাকাত গুণ্ডা বদমাশ মানুষ ঠকানো তোর স্বভাব। তোকে দেখলে বোঝা যায়–

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

সায়রা ফিস ফিস করে বলল, "মহিলাকে একটু রাগিয়ে দেয়া যাক।"

"এমনিতেই তো রেগে আছে!"

"এটা কি রাগ হলো? দেখেন মজা–।" সায়রা রাগের সুইচ টিপে দিল, তারপর যা একটা কাণ্ড হলো সেটা দেখার মতো দৃশ্য। গজনফর আলীর স্ত্রী একটা হুঙ্কার দিয়ে গজনফর আলীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, নাকে এবং পেটে ঘুসি মেরে একেবারে ধরাশায়ী করে দিলেন। গজনফর আলীকে বাঁচানোর জন্যে কয়েকজন স্টেজে ওঠার চেষ্টা করছিল, চেয়ার দিয়ে তাদের পিটিয়ে তিনি তাদের লম্বা করে ফেললেন। মাইকের স্ট্যান্ড ঘুরিয়ে ছুঁড়ে মারলেন। ট্রান্সক্রেনিয়াল স্টিমুলেটর ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। আঁ আঁ করে বুকে থাবা দিয়ে চেয়ার ঘুরাতে ঘুরাতে তিনি স্টেজ থেকে নিচে নেমে এলেন।

চেয়ারে বসে থাকা দর্শক এবং সাংবাদিকেরা কোনোভাবে সেখান থেকে পালিয়ে রক্ষা পেলো! আমিও সায়রার হাত ধরে টেনে কোনোভাবে সেই ভয়াবহ কাণ্ড থেকে পালিয়ে এসেছি।

পরের দিন সব পত্রিকায় খবরগুলো খুব বড় করে এসেছিল।

'মোল্লা গজনফর আলীর কুকীর্তি' শিরোনামে 'দৈনিক মোমের আলো'তে নিয়মিত ফিচার বের হতে শুরু করেছে।

সব সাংবাদিকেরা এখন যে 'হাবাগোবা' লোকটি এই যুগান্তকারী আবিষ্কারটি মোল্লা গজনফর আলীর কাছে প্রথম নিয়ে গিয়েছিল তাকে খুঁজছে।

নিজেকে হাবাগোবা মানুষ বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছে করে না বলে কাউকে আর পরিচয় দিইনি– তা না হলে এবারে বিখ্যাত হবার খুব বড় একটা সুযোগ ছিল।

তবে সায়রা সায়েন্টিস্টের সাথে যোগাযোগ রাখছি। সে নিশ্চয়ই আরেকটা সুযোগ করে দেবে। ঠিক করেছি সেই সুযোগটা আমি আর কিছুতেই গুবলেট করে ফেলব না।

shaibalrony@yahoo.com

মালিশ মেশিন

আমার মাঝে মধ্যে ভালো-মন্দ খাওয়ার ইচ্ছে করলে বোনের বাসায় হাজির হই– কখনো অবশ্যি স্বীকার করি না যে খেতে এসেছি, ভান করি এই দিকে কাজে এসেছিলাম যাবার সময় দেখা করে যাচ্ছি। বোনের বাসা দোতালায়– সিঁড়ি দিয়ে উঠছি হঠাৎ দেখি কে যেন ঠিক সিঁড়ির মাঝখানে একটা কলার ছিলকে ফেলে রেখেছে, মানুষের কাণ্ডজ্ঞান কতো কম হলে এরকম একটা কাজ করতে পারে? কেউ যদি ভুল করে এই ছিলকের উপর পা দেয় তাহলে কী ভয়ংকর একটা ব্যাপার ঘটে যাবে– প্রথমত পা পিছলে সে পড়ে যাবে তারপর সিঁড়ি দিয়ে গাছের গুড়ির মতো গড়িয়ে যাবে। সিঁড়ির শেষ মাথায় পৌছে এসে সে দেয়ালে আঘাত করবে তখন তার হাত-পা ভেঙে যাবে, মাথা ফেটে রক্তারক্তি হয়ে যাবে, কে জানে হয়তো ব্রেন ড্যামেজ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে।

কাজেই আমি খুব সাবধানে কলার ছিলকে বাঁচিয়ে সিঁড়িতে পা ফেললাম; আর কী আশ্চর্য– ব্যাপারটা ঠিক কীভাবে ঘটল সেটা এখনো একটা রহস্যের মতো; আমি আবিষ্কার করলাম যে আমি ঠিক ছিলকেটার উপর পা ফেলেছি। তারপর ঠিক আমি যা ভেবেছিলাম তাই ঘটল, আমি প্রথমে পা পিছলে দড়াম করে পড়ে গেলাম, তারপর গাছের গুড়ির মতো গড়িয়ে যেতে লাগলাম। প্রায় অনন্তকাল গড়িয়ে আমি সিঁড়ির নীচে পৌছে দেয়ালটাকে আঘাত করলাম, আমার হাত ভাঙল, পা ভাঙল, মাথা ফেটে রক্তারক্তি হয়ে গেলো, মাথার ভেতরে ঘিলু নড়ে উঠে ব্রেন ড্যামেজ হয়ে গেলো এবং আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। কে জানে হয়তো শুধু অজ্ঞান নয়, মরেই গেলাম।

আমার ওজন নেহায়েৎ কম নয় (দেখলে মন খারাপ হয় বলে আজকাল অবশ্যি ওজন নেয়া বন্ধ করে দিয়েছি), কলার ছিলকেতে পা পিছলে আমি নিশ্চয়ই ভীষণ শব্দ করে পড়েছি, দেয়ালে মাথা ঠুকে যাবার সময় নিশ্চয়ই একটা গগণবিদারী চিৎকারও করেছিলাম– কারণ দেখতে পেলাম দরজা খুলে আমার বোন, দুলাভাই, বিল্টু এবং কাজের বুয়া ছুটে এসেছে। বিল্টু ছোট বলে সে সবার আগে দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "মামা, তুমি এখানে শুয়ে আছ কেন?"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

সবাইকে যখন দেখতে পাচ্ছি, কথা শুনতে পাচ্ছি তার মানে নিশ্চয়ই মরে যাইনি বা অজ্ঞানও হয়ে যাইনি। কথা যেহেতু বুঝতে পারছি মনে হয় এখনো পুরোপুরি ব্রেন ড্যামেজ হয়নি। আমি কোঁকাতে কোঁকাতে বললাম, "পিছলে পড়ে গিয়েছি।"

বিল্টু কলার ছিলকেটা আবিষ্কার করে বলল, "তুমি হাঁটার সময় কী চোখগুলো খুলে পকেটের মাঝে রেখে দাও? কলার ছিলকেটা দেখনি?"

"ফাজলেমি করবি না বিল্টু– দেখছিস না হাত-পা সব ভেঙে গেছে? মাথা ফেটে গেছে।"

"তোমার কিছু হয়নি মামা, ওঠো।"

ততক্ষণে বোন, দুলাভাই এবং বুয়াও চলে এসেছে। বুয়া বলল, "না বিল্টু বাই, মামার অবস্থা কেরাসিন। মনে হয় হাত-পা ভাইঙ্গা লুলা হইয়া গেছে।"

দুলাভাই এসে আমাকে টিপে টুপে দেখে বলল, "তুমি পড়েছ খুব জোরে, কিন্তু কিছু ভাঙে টাঙে নাই।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, সত্যি।"

"উঠতে পারবে? নাকি ধরে নিতে হবে?"

বুয়া শাড়িটা কোমরে প্যাঁচিয়ে এগিয়ে এসে বলল, "মামারে আমার কোলে তুইল্যা দেন– আমি উপরে নিয়া যাই।" আমি নিজে নিজে উপরে উঠতে পারব ভরসা ছিল না, কিন্তু টিংটিংয়ে বুয়া যেভাবে আমাকে কোলে করে উপরে নিয়ে যেতে হাজির হলো যে আমি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে গেলাম। এক হাত দুলাভাইয়ের উপর আরেক হাত বিল্টু ঘাড়ে দিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে উপরে উঠে এলাম। দুলাভাইয়ের কথা সত্যি হাত-পা কিছু ভাঙেনি, মাথাও ফাটেনি। খুব বেঁচে গেছি এই যাত্রা।

আমাকে সোফায় শুইয়ে দিয়ে দুলাভাই বললেন, "তোমাকে আরো সাবধান হতে হবে। যেখানেই যাও সেখানেই যদি এইভাবে আছাড় খাও তাহলে ঢাকা শহরের সব বিল্ডিং ধসিয়ে ফেলবে।"

বোন এক গ্লাস পানি এনে বললেন, "খা তাড়াতাড়ি।"

"কী এটা?"

"লবণ পানি। পড়ে গিয়ে শক পেলে খেতে হয়।"

এটা কোন দেশী চিকিৎসা জানি না কিন্তু বোনের কথা না শুনে উপায় নেই। তাই পুরোটা খেতে হলো। বোন বললেন, "সর্ষে দিয়ে ইলিশ রেঁধেছিলাম– কিন্তু তোর যা অবস্থা, তুই তো খেতেও পারবি না।"

আমি হালকাভাবে আপত্তি করে কিছু একটা বলতে চাইছিলাম কিন্তু বুয়া চিৎকার করে বলল, "কী কন আম্মা আপনি খাওয়ার কথা? মামা এখন খাইলে উপায় আছে? শরীরে বিষ নাইম্যা যাইব না? সর্বনাশ!"

কাজেই শরীরে যেন বিষ নেমে না যায় সেজন্যে আমি সোফায় উপুড় হয়ে শুয়ে রইলাম, অন্যেরা যখন হৈ চৈ করে সর্ষে বাটা দিয়ে ইলিশ মাছ খেলো তখন আমি খেলাম আধবাটি বার্লি।

কিছুক্ষণ পর বোন এসে জিজ্ঞেস করল, "তোর শরীরের অবস্থা কী?"

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, "এখন মনে হয় ভালো। তবে ঘাড়ে খুব ব্যথা।"

"কোথায়?"

আমি হাত দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিলাম। বোন বলল, "দে একটু মালিশ করে দিই। ভালো লাগবে।"

আমি বললাম, "না, না, লাগবে না–"

বোন আমার কথা শুনল না, মাথার কাছে বসে আমার ঘাড় মালিশ করতে লাগল। প্রথমে এক দুইবার ব্যথার একটা খোঁচা অনুভব করলাম, তারপর কিন্তু বেশ আরামই লাগতে লাগল। আমি চোখ বুঁজে আরামে আহা উহু করতে লাগলাম। বোন বলল, "দাঁড়া একটু সর্ষের তেল দিয়ে নিই, দেখবি ব্যথা কোথায় পালাবে।"

ঘাড় মালিশ করতে করতে বোন বুয়াকে ডেকে খানিকটা সর্ষের তেল গরম করে দিয়ে যেতে বলল। বুয়া একটু পরেই গরম তেল দিয়ে গেলো, সেটা হাতে নিয়ে বোন বেশ কায়দা করে ঘাড়ে তেল মালিশ করে দিতে লাগল। সত্যি কথা বলতে কী বাংলা ভাষায় 'তেল মালিশ' বলে যে একটা

শব্দ আছে সেটা, কোথা থেকে এসেছে কেমন করে এসেছে– এই প্রথমবার আমি সেটা বুঝতে পারলাম। ঘাড় থেকে আরামটা আমার সারা শরীরে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল– আমার চোখ বুজে এলো এবং মনে হতে লাগল [illegible] মন্দ ব্যাপার নয়। বেহেশতে নিশ্চয়ই হুর পরীরা [illegible] চলে এলো এবং ঠিক বেহেশতের মতো মুরগি রোস্টের গন্ধ পেতে লাগলাম।

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

বেহেশতী এই ভাবটা নিশ্চয়ই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। কারণ হঠাৎ করে আমার বোন বলল, "মুরগি রোস্টের গন্ধ কোত্থেকে আসছে?"

আমি চমকে উঠলাম, বললাম, "তুমিও গন্ধ পাচ্ছ?"

বোন অবশ্যি পুরো ব্যাপারটিকে স্বর্গীয় অনুভূতি হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল না, হুংকার দিয়ে বলল, "বুয়া।"

বুয়া প্রায় সাথে সাথে ছুটে এলো, "আমারে ডাকছেন আম্মা?"

বোন তেলের বাটিটা দেখিয়ে বললেন, "এইখানে কী দিয়েছ?"

"সর্ষের তেল শেষ। মুরগি রোস্টের থেকে চিপে ঘি বের করে গরম করে দিয়েছি আম্মা!"

এক মুহূর্তে আমার স্বর্গীয় আনন্দ উবে গেল, সমস্ত ব্যথা ভুলে আমি তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বললাম, "কী বললে তুমি? কী বললে? মুরগি রোস্টের ঘি?"

বুয়া অবাক হয়ে বলল, "এতো রাগ হন কেন মামা? ঘি কী খারাপ জিনিস?"

আমি চিৎকার করে বললাম, "রসগোল্লাও তো ভালো জিনিস– তাই বলে তুমি শরীরে রসগোল্লা মেখে বসে থাকবে?"

বুয়া অবাক হয়ে বলল, "মামা, এইসব কী কয়? মানুষ শরীলে রসগুল্লা মাখবে কেন? মামার কী মাথা খারাপ হইছে?"

আমার ইচ্ছে হলো বুয়ার গলা টিপে তাকে খুন করে ফেলি, অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলাম। বোন খানিকক্ষণ চোখ লাল করে বুয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ করে হি হি করে হেসে ফেলল, কিছুতেই আর হাসি থামাতে পারে না। তার হাসি শুনে দুলাভাই আর বিল্টু ছুটে এলো, জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

বোন আমাকে দেখিয়ে বলল, "শুঁকে দেখো।"

দুলাভাই আর বিল্টু সাবধানে আমাকে শুঁকে দেখল। বিল্টু ভুরু কুঁচকে বলল, "মামা তোমার শরীর থেকে চিকেন রোস্টের গন্ধ বের হচ্ছে কেন?"

দুলাভাই বললেন, "নতুন ধরনের কোনো আফটার শেভ?"

বুয়া ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করল, "জে না। মামা শরীরে মুরগির রোস্টের ঘি মাখছে।"

দুলাভাই চোখ কপালে তুলে বলল, "সে কী? এরকম কাজ করলে কেন?"

আমি মেঘস্বরে বললাম, "আমি করি নাই।"

"তাহলে কে করেছে?"

"আপা–"

দুলাভাই বোনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটা কোন ধরনের রসিকতা? দশটা নয় পাঁচটা নয় আমার একটা মাত্র শালা তাকে তুমি ঘি মাখিয়ে রাখছ? মানুষটা সাদাসিধে বলে সবাই মিলে কেন বেচারাকে উৎপাত করো?"

বোন মাথা নাড়ল, হাসির দমকে কথা বলতে পারছে না, কোনোমতে বলল, "আমি ইচ্ছা করে করি নাই– এই বুয়া।"

সবাই মিলে হাসাহাসি করছে দেখে বুয়াও হঠাৎ করে খুব উৎসাহ পেয়ে গেলো, সেও হাসতে হাসতে বলল, "গোন্ধটা খারাপ না। এখন আপনাকে দেখলে মনে হয় একটা কামড় দেই। হি হি হি–"

আমার ঘাড়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, বাম পা-টা টনটন করছে, কপালের কাছে খানিকটা ফুলে গেছে এবং সেই অবস্থায় ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আমি চলে এলাম, ঠিক করলাম যতদিন এই বুয়া বাসায় আছে আমি আর সেই বাসায় যাচ্ছি না।

পরের এক সপ্তাহ আমার শরীর থেকে মুরগির রোস্টের গন্ধ বের হতে লাগল। যার সাথেই দেখা হয় সেই বলে, "চিকেন রোস্ট আপনার খুব ফেবারিট? আচ্ছা মতোন খেয়েছেন মনে হচ্ছে– শরীর থেকে গন্ধ বের হচ্ছে!"

সপ্তাহ দুয়েক পর ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করলাম রাতে নিশ্চয়ই বেকায়দায় ঘুমিয়েছি, ঘাড়ে ব্যথা। এর আগের বার বোন মালিশ করে

দিয়েছিল– ভারী আরাম লেগেছিল সেদিন, আমি তাই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ঘাড় মালিশ করতে শুরু করলাম। একটু পরেই আবিষ্কার করলাম আজকে সেরকম আরাম লাগছে না। অন্যে মালিশ করে দিলে যেরকম আরামে একেবারে চোখ বন্ধ হয়ে আসে নিজে মালিশ করলে তার ধারে কাছে যাওয়া যায় না। কারণটা কী? এর নিশ্চয়ই একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। অনেকদিন সায়রা সায়েন্টিস্টের বাসায় যাওয়া হয়নি– একবার গিয়ে জিজ্ঞেস করে এলে হয়। যারা খেতে পছন্দ করে তাদের বাসায় দইয়ের হাড়ি নিয়ে যেতে হয়, যে কবি তার বাসায় যেতে হয় কবিতার বই নিয়ে। যে গান গায় সে নিশ্চয়ই খুশি হয় গানের সিডি পেলে, যে বিজ্ঞানী তার কাছে নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়েই যাওয়া উচিৎ।

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

পরদিন বিকেল বেলা আমি সায়রা সায়েন্টিস্টের বাসায় হাজির হলাম। আমাকে দেখে সায়রা বললেন, "ভালোই হয়েছে আপনি এসেছেন। মনে মনে আমি আপনাকেই খুঁজছি।"

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন? আবার কোনো এক্সপেরিমেন্ট?"

"না, এক্সপেরিমেন্ট না। একটা মতামত জানার জন্যে আপনার খোঁজ করছিলাম।"

সায়রার কথা শুনে গর্বে আমার বুকটা কয়েক ইঞ্চি ফুলে গেলো, আমার পরিচিতদের কেউই আমাকে খুব সিরিয়াসলি নেয় না। কখনো কেউ আমার মতামত জানতে চেয়েছে বলে মনে পড়ে না। অথচ সায়রা এত বড় বিজ্ঞানী হয়ে আমার মতামত জানতে চাইছে! আমি মুখে এটা গাম্ভীর্য এনে জিজ্ঞেস করলাম, "কোন বিষয়ে মতামত?"

"রসগোল্লা না সন্দেশ, কোনটা আপনার পছন্দ?"

আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম, ভেবেছিলাম সায়রা বুঝি দেশ, সমাজ, রাজনীতি, ফিলসফি এরকম কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে! অবশ্যি একদিক দিয়ে ভালোই হলো জটিল কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়া কঠিন হয়ে যেতো– সেই হিসেবে এই প্রশ্নটাই ভালো। আমি বললাম, "আমার ব্যক্তিগত পছন্দ রসগোল্লা–"

"কেন?"

"জিনিসটা রসালো, নরম, মিষ্টি বেশি।"

"না, না, না–" সায়রা আমাকে থামিয়ে দিয়ে জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "আমি স্বাদের কথা বলছি না।"

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "তাহলে?"

"আকারের কথা বলছিলাম।"

"আকার?"

"হ্যাঁ।" সায়রা গম্ভীর মুখে বলল, "একটা হচ্ছে গোল, আরেকটা চতুষ্কোণ। কোনটা সঠিক?"

আমি মাথা চুলকাতে শুরু করলাম। রসগোল্লা আর সন্দেশের আকারে যে সঠিক আর বেঠিক আছে কে জানতো? আমতা আমতা করে বললাম, "ইয়ে– দুইটা দুই রকম। মনে করেন রসগোল্লা যদি চারকোণা হতো তাহলে কী সেটাকে রসগোল্লা বলা যেতো? বলতে হতো রসকিউব। কিন্তু যেমন কেউ ভয় পেলে আমরা বলি চোখ রসগোল্লার মতো বড় হয়েছে– যদি রসগোল্লা না থেকে শুধু রসকিউব থাকতো তাহলে আমরা কী সেটা বলতে পারতাম?"

সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "আপনি ব্যাপারটা ধরতে পারছেন না। আমি বলছি আকার আর সাইজের দিক থেকে! মনে করেন আপনি পুরো ফ্রিজে রসগোল্লা আর সন্দেশ দিয়ে ভরে ফেলতে চান। কোনটা বেশি রাখতে পারবেন?"

আমি আবার মাথা চুলকালাম, এক ফ্রিজ বোঝাই শুধু রসগোল্লা কিংবা শুধু সন্দেশ– চিন্তা করেই আমার গা গুলিয়ে যায়। কী উত্তর দেব বুঝতে পারছিলাম না, সায়রা বক্তৃতা দেয়ার মতো করে বলল, "সন্দেশ! কেন জানেন?"

"কেন?"

"কারণ সন্দেশ হচ্ছে কিউব, তাই সন্দেশের গায়ে গায়ে লেগে থাকতে পারে– কোনো জায়গা নষ্ট হয় না। কিন্তু রসগোল্লা হচ্ছে গোলক, এগুলো রাখলে তার মাঝে ফাঁকা জায়গা থাকে।"

আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম কিন্তু এতো জিনিস থাকতে সায়রা কেন এই জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে বুঝতে পারলাম না। আমার মুখ দেখে মনে হয় সায়রা সেটা টের পেলো, জিজ্ঞেস করল, "কেন আমি এটা বলছি বুঝতে পারছেন?"

"না।"

"খুব সহজ।" সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "মনে করেন ডিমের কথা। ডিম যদি ডিমের মতো না হয়ে চারকোণা কিউবের মতো হতো তাহলে কী হতো?"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

"ডিম পাড়তে মুরগিদের খুব কষ্ট হতো।"

"না– না সেটা বলছি না!"

"তাহলে কোনটা বলছেন?"

"ডিম স্টোর করা কতো সহজ হতো চিন্তা করতে পারেন? একটার উপর আরেকটা রেখে দেয়া যেতো। সেরকম তরমুজ যদি চারকোণা হতো তাহলে অল্প জায়গায় অনেক বেশি তরমুজ রাখা যেতো। আলু টমেটো যদি চারকোণা হতো– অল্প জায়গায় অনেক বেশি জিনিস রাখা যেতো।"

আমি চতুষ্কোণ কিউবের মতোন ডিম, আলু, তরমুজ কিংবা টমেটো চিন্তা করার চেষ্টা করলাম– কিন্তু কাজটা কেন জানি সহজ হলো না, উল্টো আমার শরীর কেমন জানি শির শির করতে লাগল। সায়রা সেটা লক্ষ্য করল না, মুখ শক্ত করে বলল, "আমি ঠিক করেছি যত ফলমূল আছে সবকিছু চতুষ্কোণ কিউবের মতো বানিয়ে ফেলব।"

"সব?"

"হ্যাঁ। লাউ, কুমড়া, পটল, ঝিঙে থেকে শুরু করে আলু টমেটো ডিম কিছুই বাকি রাখব না। গরিব দেশে কোল্ড স্টোরেজে এসব রাখতে কতো জায়গা নষ্ট হয়– একবার কিউব বানিয়ে ফেললে আর কোনো জায়গা নষ্ট হবে না। কী বলেন আপনি?"

আমি মাথা চুলকালাম– উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তাই বলে চারকোণা কিউবের মতো লাউ? কুমড়া? পটল? ডিম? সবকিছুই যদি চারকোণা হয়ে যায় তখন কী হবে? গাড়ীর চাকা চারকোণা, চোখের মণি চারকোণা– ফুটবল চারকোণা– আকাশের চাঁদ চারকোণা– চিন্তা করেই আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। আমার জন্যে শেষ পর্যন্ত সায়রার মনে হয় একটু মায়াই হলো, বলল, "আপনি আসার পর থেকেই শুধু আমিই বক বক করে যাচ্ছি। এবারে আপনার কী খবর বলেন?"

আমি বললাম, "ভালো। তবে–"

"তবে কী?"

"খুব ভালো ছিলাম না।"

"কেন?"

আমি তখন কলার ছিলকে আর মুরগির রোস্টের কাহিনী শুনালাম। সায়রা মোটামুটি ভদ্র মেয়ে– অন্যদের মতো হেসে গড়িয়ে পড়ল না। গল্প শেষ করে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সেই ঘটনার পর আপনার কাছে একটা প্রশ্ন।"

"কী প্রশ্ন?"

"মালিশ করলে খুব আরাম লাগে, কিন্তু নিজে নিজে মালিশ করলে এতো আরাম লাগে না, ব্যাপারটা কী?"

আমার প্রশ্ন শুনে সায়রা ফিক করে একটু হেসে ফেলল, বলল, "কঠিন প্রশ্ন করে ফেলেছেন! সত্যিই তো তাই!" সে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "মালিশ করলে সেখানে ব্লাড সার্কুলেশন বেড়ে যায়, নার্ভ দিয়ে একটা স্টিমুলেশন যায় সেজন্যে ভালো লাগে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, আপনাকে ব্যাপারটা একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাই।"

"কী এক্সপেরিমেন্ট?"

"এই দেওয়ালে একটা ঘুষি মারেন দেখি।"

"দেওয়ালে ঘুষি মারব? ব্যথা লাগবে না?"

"না ব্যথা লাগবে না– আমি ব্যথা না লাগার একটা স্পেশাল ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি।" সায়রা উঠে গিয়ে পানির মতো কী একটা ওষুধ এনে আমার হাতের আঙুলে লাগিয়ে দিল। বলল, "মারুন ঘুষি।"

আমি দেওয়ালে ঘুষি মেরে বাবাগো বলে হাত চেপে বসে পড়লাম, মনে হলো সবগুলো আঙুল ভেঙে গেছে। বাম হাত দিয়ে ডান হাতের ব্যথা পাওয়া জায়গায় হাত বুলাতে বুলাতে ভাঙা গলায় বললাম, "আপনার ওষুধ কাজ করল না দেখি! ভয়ংকর ব্যথা লেগেছে।

"এইটা ওষুধ ছিল না। এইটা ছিল পানি।"

"তাহলে?"

"ইচ্ছে করে বলেছিলাম যেন আপনি একটু ব্যথা পান।"

"কেন? আমি কী করেছি? আমাকে ব্যথা দিচ্ছেন কেন?"

"আপনি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছেন।"

"আমি এক্সপেরিমেন্ট করছি? কখন?"

সায়রা হাসি হাসি মুখে বলল, "এই যে আপনি যেখানে ব্যথা পেয়েছেন সেখানে হাত বুলাচ্ছেন। এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট।"

"কীভাবে?"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

"মানুষ যখন ব্যথা পায় তখন ব্যথার অনুভূতিটা নার্ভের ভেতর দিয়ে [illegible] লাগে। যখন আপনি ব্যথা পাওয়া জায়গায় হাত বুলাতে থাকেন তখন ব্যথার সাথে সাথে স্পর্শের অনুভূতিটাও পাঠাতে হয়। আপনার নার্ভ তখন কিছু সময় পাঠায় ব্যথার অনুভূতি– অন্য সময় পাঠায় স্পর্শের অনুভূতি– যেহেতু ব্যথার অনুভূতিটা স্পর্শের অনুভূতির সাথে ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে তাই সেটা কমে যায়। বুঝেছেন?"

আমি মাথা নাড়লাম, "বুঝেছি।" সায়রার কথা বিশ্বাস করে মনে হয় একটু বেশ জোরেই ঘুষি মেরেছিলাম ভাগাভাগি করার পরও হাতটা ব্যথায় টনটন করছে।

"কাজেই যখন নিজে মালিশ করেন তখন মালিশের যে আরামের অনুভূতি– সেটা মালিশ করার সাথে ভাগাভাগি করে হয়– আমার মনে হয় সেটা একটা কারণ হতে পারে– যে কারণে অন্য কেউ মালিশ করলে পুরো আরামের অনুভূতিটা পাওয়া যায়।"

"কিন্তু মালিশ করার জন্যে অন্য মানুষকে ভাড়া করা জিনিসটা কেমন দেখায়?"

সায়রা মাথা নাড়ল, "একেবারেই ভালো দেখায় না।"

"কাজেই এরকম আরামের একটা জিনিস– কিন্তু কখনই পাওয়া যাবে না।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন। একজন মানুষ খালি গায়ে বসে আছে আরেকজন তাকে তেল মাখিয়ে দলাই মলাই করছে ব্যাপারটা খুবই কুৎসিত। কিন্তু–"

"কিন্তু কী?"

সায়রা হঠাৎ করে অন্যমনস্ক হয়ে গেলো। একবার সে অন্যমনস্ক হয়ে গেলে হঠাৎ করে কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়। দশটা প্রশ্ন করলে একটার উত্তর দেয়, সেই উত্তরও হয় দায়সারা– কাজেই আমি আর সময় নষ্ট না করে সায়রার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

মাসখানেক পরে হঠাৎ একদিন আমি সায়রার ই-মেইল পেলাম। বরাবরের মতো ছোট ই-মেইল, সেখানে লেখা :

জরুরি। দেখা করুন।

আমি সেদিন বিকাল বেলাতেই সায়রার বাসায় হাজির হলাম। সায়রার মুখ আনন্দে ঝলমল করছে, নতুন কিছু আবিষ্কার করলে তার মুখে এরকম আনন্দের ছাপ পড়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "নতুন কিছু আবিষ্কার করেছেন নাকি?

"বলতে পারেন করেছি।"

"কী জিনিস?"

"আপনাকে দেখাব, ধৈর্য ধরেন। তার আগে অন্য একটা জিনিস দেখাই।"

"কী?"

সায়রা তার শেলফের দিকে দেখিয়ে বলল, "এই দেখেন।" আমি তাকিয়ে দেখি তার শেলফ বোঝাই মালিশের বই। মাথা মালিশ, ঘাড় মালিশ, পেট মালিশ, পিঠ মালিশ থেকে শুরু করে চোখের ভুরু মালিশ, চোখের পাতি মালিশ এমনকি কানের লতি মালিশ পর্যন্ত আছে! সেই মালিশের কায়দা কানুন এসেছে সারা পৃথিবী থেকে– ভারতীয় আয়ুর্বেদীয় মালিশ থেকে শুরু করে চীন-জাপান-কোরিয়ান মালিশ, আমেরিকান পাওয়ার মালিশ, মেক্সিকান ঝাল মালিশ, আফ্রিকান গরম মালিশ এমনকি একেবারে এস্কিমো ঠাণ্ডা মালিশও আছে। শুধু যে বই তাই নয়, ভিডিও, সিডি, কাগজের বান্ডিল সবকিছুতে বোঝাই। আমি অবাক হয়ে বললাম, "করেছেন কী? পৃথিবীর সব মালিশের বই সিডি ক্যাসেট নিয়ে এসেছেন মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ"

"কেন?"

"ব্যাপারটা একটু স্টাডি করে দেখলাম।"

"কী দেখলেন?"

"আপনি এই চেয়ারটায় বসেন, আমি দেখাই।"

এর আগেও সায়রার কথা শুনে এরকম চেয়ারে বসে বড় বড় বিপদে পড়েছি। ভয়ে ভয়ে বললাম, "কোনো বিপদ হবে না তো?"

"না। কোনো বিপদ হবে না।"

আমি সাবধানে চেয়ারে বসলাম। সায়রা বলল, "চোখ বন্ধ করেন।"

যে ব্যাপারটাই ঘটুক– চাইছিলাম চোখের সামনেই সেটা হোক, কিন্তু সায়রার কথা শুনে চোখ বন্ধ করতে হলো। সায়রা পেছনে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি খুব সাবধানে আপনার ঘাড় স্পর্শ করছি।"

টের পেলাম সায়রা আমার দুই ঘাড় স্পর্শ করল। "এবারে হালকাভাবে মালিশ করে দিচ্ছি– এটি হচ্ছে কোরিয়ান মালিশ।"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

আমি চোখ বন্ধ করে টের পেলাম খুব দক্ষ মানুষের মতো সায়রা [illegible] ভদ্র মহিলা আমার ঘাড় মালিশ করে দিচ্ছে চিন্তা করে আমার একটু অস্বস্তি হতে লাগল কিন্তু সে এমন এক্সপার্টের মতো হাত চালিয়ে যাচ্ছে যে আরামে আমার শরীর অবশ হয়ে এলো।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর আমি বললাম, "এখন চোখ খুলতে পারি?"

সায়রা বলল, "খুলেন।"

আমি চমকে উঠলাম, সায়রা আমার পিছনে দাঁড়িয়ে ঘাড় মালিশ করে দিচ্ছে কিন্তু উত্তরটা আসলো সামনে থেকে। আমি চোখ খুলে একেবারে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম, সায়রা সামনে একটা চেয়ারে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে! অন্য কেউ আমার ঘাড় মালিশ করছে।

আমি পেছনে তাকালাম, কেউ নেই। ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখি দুটো হাত ঘাড়ের মাংসপেশী ডলে দিচ্ছে। একটু ভালো করে তাকালাম, সত্যিকারের হাত কোনো সন্দেহ নেই– কিন্তু সেটা কনুইয়ের কাছে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। আতঙ্কে চিৎকার করে আমি হাত দুটি ধরে ছুঁড়ে দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেগুলো প্রচন্ড শক্তিশালী, আমার ঘাড় কিছুতেই ছাড়বে না। আমি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে সারা ঘরে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলাম, পায়ের সাথে ধাক্কা লেগে একটা টেবিল ল্যাম্প, দুইটা ফুলদানী, বইয়ের শেলফ উল্টে পড়ল। আমি লাফিয়ে কুদিয়ে গড়াগড়ি দিয়ে সেই ভয়ঙ্কর ভৌতিক দুটো হাত থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করতে লাগলাম– কিন্তু কিছুতেই ছাড়া পেলাম না। আমার লাফঝাপ দেখে সায়রা ভয় পেয়ে কোথায় জানি ছুটে গিয়ে একটা সুইচ টিপ দিতেই হঠাৎ করে হাত দুটো আমাকে ছেড়ে দিয়ে কেমন যেন নেতিয়ে পড়ল। আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দুই লাফে সরে গিয়ে ভয়ে ভয়ে সেই কাটা হাত দুটোর দিকে তাকালাম, এখনো প্রচণ্ড আতঙ্কে আমার বুকের ভেতরে ধক ধক শব্দ করছে।

সমস্ত ঘরের একেবারে লণ্ডভণ্ড অবস্থা, এর মাঝে সায়রা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি একটু শান্ত হবার পর সায়রা জিজ্ঞেস করল, "আপনি– আপনি কী করছেন?"

আমি হাত দুটো দেখিয়ে বললাম, "এগুলো কার কাটা হাত?"

সায়রা হেঁটে গিয়ে হাত দুটো তুলে বলল, "কাটা হাত? কাটা হাত [illegible] পরিয়ারের হাত। ভেতরে মাইক্রো প্রসেসর কন্ট্রোলড যন্ত্রপাতি আছে।"

আমার তখনও বিশ্বাস হচ্ছিল না, বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, "তার মানে এইগুলো সত্যিকারের হাত না?"

সায়রা চোখ কপালে তুলে বলল, "আপনি সত্যিই মনে করেন আমি মানুষের হাত কেটে বাসায় নিয়ে আসব?"

"না, মানে ইয়ে–" আমি আমতা আমতা করে বললাম, "আমি ভেবেছিলাম ভৌতিক কিছু।"

"ভৌতিক? দিন দুপুরে ভৌতিক?" সায়রা রেগে গিয়ে বলল, "আপনি সত্যিই মনে করেন পৃথিবীতে ভৌতিক জিনিস থাকা সম্ভব?"

ভূত আছে কী নেই সেটা নিয়ে একটা নতুন তর্ক শুরু হয়ে গেলে বিপদে পড়ে যাব, তাই আমি কথা ঘোরানোর জন্যে বললাম, "এইগুলি আপনি নিজে তৈরি করেছেন?"

ভাঙা টেবিল ল্যাম্প, ফুলদানী তুলতে তুলতে সায়রা মুখ বাঁকা করে বলল, "না, এগুলো তো কিনতে পাওয়া যায় তাই আমি ধোলাই খাল থেকে কিনে এনেছি!"

আমিও লণ্ডভণ্ড ঘরটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে করতে বললাম, "আই অ্যাম সরি– হঠাৎ করে দেখে এতো ভয় পেয়ে গেলাম।"

সায়রা কঠিন মুখ করে বলল, "আপনি যখন এরকম ভীতু মানুষ– আপনার ঘর থেকেই বের হওয়া উচিৎ না। দরজা বন্ধ করে বসে থাকবেন, একটু পরে পরে আয়াতুল কুরসী পড়ে বুকে ফুঁ দিবেন। আরও ভালো হয় কোনো পীর সাহেবকে ধরে গলায় একটা তাবিজ লাগিয়ে নিলে–"

সায়রা রেগে গেছে, আমি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে বললাম, "আমাকে শুধু শুধু দোষ দিচ্ছেন। হাত দুটো এমন চমৎকারভাবে আমার ঘাড় মালিশ করছিল যে আমি একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর ছিলাম যে এগুলো আপনার হাত! যখন তাকিয়ে দেখি আপনি সামনে– আর হাত দুটো কনুই পর্যন্ত– ভয়ে আমার পেটের ভাত চাউল হয়ে গেলো। আপনি আমার জায়গায় থাকলে আপনারও হতো–"

আমার কথা শুনে সায়রার রাগ একটু কমলো মনে হলো। বলল, "তাহলে আপনি বলছেন এটা একেবারে সত্যিকারের হাতের মতো?"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

"সত্যিকার থেকে ভালো। কেমন করে তৈরি করলেন?"

"আমার সমস্যা হয়েছে। আঙুল কীভাবে নড়াব, কতটুকু চাপ দেবে, কতটুকু ঘষা দেবে সবকিছু হিসাব করে বের করতে হয়েছে। তারপর যান্ত্রিক একটা হাত তৈরি করতে হয়েছে, সেটার সাথে মাইক্রো প্রসেসর ইন্টারফেস লাগাতে হয়েছে। প্রোগ্রামিং করতে হয়েছে, পুরো প্রোগ্রামটি ডাউনলোড করে ই-প্রম ব্যবহার করে ভেতরে বসাতে হয়েছে।"

"এতো কষ্ট করে এটা তৈরি করলেন?"

সায়রা উদাস গলায় বলল, "খালি গায়ে একজন তেল মেখে বসে আছে আরেকজন তাকে দলাই মলাই করছে দৃশ্যটা এতো কুৎসিত– তাই এটা তৈরি করলাম। যে কেউ পড়াশোনা করতে করতে, টিভি দেখতে দেখতে কিংবা গান শুনতে শুনতে শরীরের যে কোনো জায়গা ম্যাসেজ করাতে পারবে।"

আমি বললাম, "কী সাংঘাতিক!"

"হ্যাঁ"। সায়রা বলল, "আমি এটা তৈরি করেছিলাম আপনার জন্যে– কিন্তু আপনি যা একটা কাণ্ড করলেন, এখন মনে হচ্ছে বক্সে তালা মেরে রাখতে হবে।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "আ-আ-আমার জন্যে তৈরি করেছেন? আ-আ-আমার জন্যে?"

সায়রা বলল, "আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই– এটা আপনাকে নিতে হবে না! এটা দেখে ভয় পেয়ে হার্টফেল করে আপনি মারা যাবেন আর পুলিশ এসে আমাকে এরেস্ট করে নিয়ে যাবে! আমি তার মাঝে নেই।"

আমি হড় বড় করে বললাম, "না-না-না! আমি আর ভয় পাব না। একেবারেই ভয় পাব না। বিশ্বাস করেন– এই যে আমার নাক ছুঁয়ে বলছি, চোখ ছুঁয়ে বলছি–"

সায়রা ভুরু কুঁচকে বলল, "নাক ছুঁয়ে বললে চোখ ছুঁয়ে বললে কী হয়?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "তাতো জানি না। কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়।"

সায়রা হেসে বলল, "তার মানে আপনি বলছেন এই রবোটিক হ্যান্ড ফর অটোমেটেড মাসল রিলাক্সিং ডিভাইস উইথ মাইক্রো প্রসেসর ইন্টারফেসটা নিতে আপনার আপত্তি নেই?

আমি জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললাম, "না, কোনো আপত্তি নাই।"

সায়রা বলল, "আপনি কিন্তু মনে করবেন না এটা আপনাকে দিচ্ছি শুধু মজা করার জন্যে। এর পিছনে কিন্তু গভীর বৈজ্ঞানিক ব্যাপার আছে।"

আমি [illegible] বললাম, "কি ধরনের বৈজ্ঞানিক ব্যাপার?"

"আপনি এটার ফিল্ড টেস্ট করবেন। আপনাকে একটা ল্যাবরেটরি নোট বই কিনতে হবে এবং সেখানে সবকিছু লিখে রাখতে হবে। আপনি আমার জন্যে ডাটা রাখবেন।"

ব্যাপারটা কীভাবে করতে হয় সেটা নিয়ে আমার কোনো ধারণা নেই কিন্তু আমি তবু ঘাবড়ালাম না, মাথা নেড়ে বললাম, "রাখব।"

"ভেরি গুড।" সায়রা বলল, "এখন তাহলে আপনাকে দেখিয়ে দেই এটা কীভাবে কাজ করে।"

আমি বললাম, "তার আগে আমার একটি কথা আছে।"

"কী কথা?"

"আমি আপনার এই যন্ত্রকে এরকম কটমটে নাম দিয়ে ডাকতে পারব না।"

"তাহলে এটাকে কী ডাকবেন?"

"আমি এটাকে ডাকব 'মালিশ মেশিন'।"

আমার কথা শুনে সায়রা হি হি করে হেসে বলল, "আমার এতো কষ্ট করে তৈরি করা এরকম মডার্ন একটা যন্ত্রের এরকম মান্ধাতা আমলের নাম দিয়ে দিলেন?"

আমি জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বললাম, "আমি মানুষটাই তো মান্ধাতা আমলের।"

"ঠিক আছে!" সায়রা মাথা নেড়ে বলল, "আপনার যেটা ইচ্ছে হয় সেটাই ডাকেন। আগে আসেন আপনাকে শিখিয়ে দেই এটা কীভাবে কাজ করে।"

আমি একটু ভয়ে ভয়ে বললাম, "আমি কী শিখতে পারব?"

"নিশ্চয়ই পারবেন।" সায়রা তার যন্ত্রের হাত দুটোকে তুলে নিয়ে বলল, "আমি এটা এমনভাবে ডিজাইন করেছি যেন খুব সহজে ব্যবহার করা যায়।"

আমি খুশি হয়ে বললাম, "ভেরি গুড।" তারপর সায়রার পিছু পিছু তার ল্যাবরেটরির ঘরের দিকে রওনা দিলাম।

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

সন্ধ্যে বেলা আমি আমার ঘরে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসেছি। আমার কোলে একটা [illegible] নোট বইয়ের উপরে লেখা 'মালিশ মেশিন সংক্রান্ত তথ্য'। সায়রা যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছে ঠিক সেভাবে আজকে আমি বৈজ্ঞানিক তথ্য নেব– বলা যায় জীবনের প্রথম। সায়রার তৈরি করা হাত দুটো সামনে রাখা আছে– আমি জানি এটা যান্ত্রিক হাত, ভেতরে যন্ত্রপাতি এবং ইলেকট্রনিক্স এবং পুরোটা এক ধরনের পলিমার দিয়ে তৈরি। তারপরেও মেঝেতে রেখে দেয়া হাত দুটোকে দেখে আমার কেমন জানি গায়ে কাটা দিয়ে উঠতে থাকে।

সায়রা পুরোটা এমনভাবে তৈরি করেছে যেন ব্যবহার করতে কোনো সমস্যা না হয়। পুরোটা সাউন্ড একটিভেটেড অর্থাৎ শব্দ দিয়ে চালু করা যায়। আমাকে কোনো সুইচ টিপতে হবে না শুধু জোরে একবার হাত তালি দিতে হবে। বন্ধ করার জন্যে তিনবার, দু'বার কাছাকাছি তৃতীয়বার একটু পরে। এখন মালিশ মেশিন চালু করার জন্যে আমি হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে জোরে একবার হাত তালি দিলাম।

সাথে সাথে হাত দুটো জীবন্ত হাতের মতো নড়ে উঠল। আমি নিশ্চিতভাবে জানি এটা যন্ত্রের হাত তারপরেও আমার কেমন জানি ভয়ে শরীর শির শির করতে থাকে। হাত দুটো কেমন জানি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে, তারপর আঙুলগুলো দিয়ে হাঁটতে থাকে, আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইলাম, দেখলাম হাত দুটো মেঝেতে খামচে খামচে আমার পিছনে গিয়ে চেয়ার বেয়ে উঠতে লাগল। একটু পরে টের পেলাম দুটো হাত আমার ঘাড়ের দুই পাশে আঁকড়ে ধরেছে। আমি শক্ত হয়ে বসে রইলাম এবং টের পেলাম হাত দুটো খুব সাবধানে আমার ঘাড় মালিশ করতে শুরু করেছে। প্রথমে খুব আস্তে আস্তে তারপর একটু জোরে। হাত দুটো আমার ঘাড় থেকে দুই পাশে একটু নেমে গেলো, গলায় হাত বুলিয়ে পিঠের দিকে মালিশ করে দিল। আস্তে আস্তে হাত নাড়িয়ে সেটা নিচে থেকে উপরে, উপর থেকে নিচে তারপর দুই পাশে সরে যেতে লাগল। খুব ধীরে ধীরে আমার শরীরটা শিথিল হয়ে আসে, এক ধরনের আরাম সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, আমার হাত-পা, ঘাড়, মাথা সবকিছু কেমন জানি অবশ হয়ে আসে। আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসতে থাকে এবং আমি আরামে আহ্ উহ্ করে

একেবারে নেতিয়ে পড়তে থাকি। রাত্রে ঘুমানোর আগে 'মালিশ মেশিন সংক্রান্ত তথ্য' নোট বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় লিখলাম :

১৪ই অক্টোবর রাত্রি দশটা তিরিশ মিনিট

[illegible] সেশান। অল্প কাতুকুতু অনুভব হয়।
তবে মেঝেতে খামচে খামচে আসার দৃশ্যটি ভীতিকর।
দুর্বল হার্টের মানুষের জন্যে সুপারিশ করা গেলো না।
মালিশের সাথে তৈল প্রদানের ব্যবস্থা করা যায়।

নিজের লেখাটি পড়ে আমি বেশ মুগ্ধ হয়ে গেলাম, কী সুন্দর গুছিয়ে লিখেছি, পড়লেই একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা গবেষণা ভাব আছে বলে মনে হয়।

মালিশ মেশিনের হাত দুটো কোথায় রাখা যায় ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, আজকের জন্যে আপাতত খাটের নীচে রেখে দিলাম। মশারী টানিয়ে শুয়ে শুয়ে আমি 'মালিশ মেশিন' নিয়ে কী কী করা যায় সেটা চিন্তা করতে করতে ঘুমানোর চেষ্টা করতে থাকি। দেশের অবস্থা খারাপ, চোর ডাকাতের উৎপাত খুব বেড়েছে। প্রতিদিনই খবর পাচ্ছি আশপাশে কারো বাসা থেকে কিছু না কিছু চুরি হচ্ছে। আমার বাসায় এমনিতেই কিছু নেই কিন্তু চোর এসে যদি মালিশ মেশিনের হাত দুটো চুরি করে নিয়ে যায় তাহলে আমি খুব বিপদে পড়ে যাব। কালকেই ভালো দেখে একটা লোহার ট্রাঙ্ক কিনে আনতে হবে– দেরী করা ঠিক হবে না।

আমি অবশ্যি তখনো জানতাম না যে আসলে এর মাঝেই অনেক দেরী হয়ে গেছে।

এমনিতে আমার ঘুম খুব গভীর, বাসায় বোমা পড়লেও ঘুম ভাঙে না– কিন্তু ঠিক কি কারণ জানি না রাত্রি বেলা আমার ঘুম ভেঙে গেলো। আমি শুয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করলাম কেন হঠাৎ ঘুমটা ভেঙেছে কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না। তলপেটে একটু চাপ অনুভব করছিলাম, বাথরুমে গিয়ে সেই চাপটা কমিয়ে আসব কি না চিন্তা করছিলাম কিন্তু বিছানা থেকে ওঠার ইচ্ছে করছিল না তাই আবার ঘুমানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। ঠিক তখন মনে হলো ঘরের ভেতর কয়েকজন মানুষ ঘোরাঘুরি করছে। আমি এই বাসায়

একা থাকি– আর কারো ঘোরাঘুরি করার কথা নয়। যারা ঘোরাঘুরি করছে তারা নিশ্চয়ই ভুল করে চলে আসেনি– ইচ্ছে করেই এসেছে। ইচ্ছেটা যে খুব মহৎ না সেটাও বোঝা খুব সহজ। আমার জন্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে ঘুমের ভান করে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা, মানুষগুলো যখন দেখবে এখানে কেউ নেই তখন নিজেরাই যেদিক দিয়ে এসেছে সেদিক দিয়ে বের হয়ে যাবে। আমার শরীরের বিভিন্ন অংশ মনে হয় আমার ইচ্ছে মতো চলে না– নিজেদের একটা স্বাধীন মতামত আছে। এই মাত্র কিছুদিন আগে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমার পা একটা কলার ছিলকের মাঝে পা দিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। আজকেও তাই হলো, আমি হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম যে আমি বলে বসেছি– "কে?"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

ঘরের ভেতরে যারা ঘোরাঘুরি করছিল– তারা যে যেখানে ছিল সেখানে থেমে গেলো। শুনলাম একজন বলল, "কাউলা, মক্কেল তো ঘুম থেকে উঠছে মনে লয়।"

কাউলা নামের মানুষটা বলল, "ঠিকই কইছেন ওস্তাদ। গুলি করমু?"

"অন্ধকারে করিস না। মিস করলে গুলি নষ্ট হইব। গুলির কত দাম জানস না হারামজাদা?"

অন্ধকারে গুলি করে– পাছে গুলি নষ্ট হয়ে যায় সেই ভয়ে ঘরের ভেতরের মানুষগুলো লাইট জ্বালালো। আমি দেখলাম দুইজন মানুষ, একজন কুচকুচে কালো। মনে হয়, সেই জন্যেই নাম কাউলা। অন্যজন শুকনা এবং দুবলা। নাকের নীচে ঝাটার মতো গোঁফ, ঠিক কী কারণ জানি না, মাথার মাঝে একটা বেসবল ক্যাপ। দুইজনেই হাফ প্যান্ট পরে আছে– হাফপ্যান্টের নীচে শুকনো শুকনো পা গুলো কোমল যেন বিতিকিচ্ছি হয়ে বের হয়ে আছে। কাউলার পরনে একটা লাল গেঞ্জি। একটা সবুজ রঙের টী শার্ট পরে আছে, টী শার্টে মাইকেল জ্যাকসনের ছবি। কাউলার হাতে একটা বন্দুকের মতো অস্ত্র– মনে হয় এইটাকে কাটা রাইফেল বলে। ওস্তাদের হাতে একটা পিস্তল। হঠাৎ আলো জ্বালানোতে সবার চোখই একটু ধাঁধিয়ে গেছে। ওস্তাদ তার মাঝে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে মশারীর কাছে এগিয়ে এসে আমাকে দেখার চেষ্টা করল, আমাকে দেখে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কাউলা!"

"জে ওস্তাদ।"

"ভুল বাসা।"

কাউলা নামের মানুষটা চমকে উঠে বলল, "কী কন ওস্তাদ! ভুল বাসা?"

"হয় হারামজাদা। এই দ্যাখ–" বলে মানুষটা মশারী তুলে আমাকে দেখাল।

আমি জানি, আমাকে দেখে মানুষ জন খুব খুশি হয় না– কিন্তু এই মাঝরাতে আমাকে দেখে দুই ডাকাতের যা মন খারাপ হলো সেটা আর বলার মতো নয়।

কাউলা বলল, "হায় হায়। এইটা তো দেহি সেই হাবাগোবা মানুষটা!"

ওস্তাদ চোখ লাল করে কাউলার দিকে তাকিয়ে বলল, "হারামজাদা, একটা সহজ কাজ করতে পারস না? এতো কষ্ট করে গ্রীল কাইটা ঢুকলাম– আর অহন দেহি ভুল বাসা।"

কাউলা মুখ কাচুমাচু করে বলল, "ভুল হয়ে গেছে ওস্তাদ! বাইরে থন মনে হইল দোতালা– আসলে তিন তালা।"

"এখন কী করবি?"

"আইছি যহন যা পাই লইয়া যাই।"

তখন কাউলা এবং ওস্তাদ দুইজনেই আমার ঘরের চারপাশে তাকিয়ে একটা বিশাল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওস্তাদ বলল, "এর তো দেহি কিছুই নাই। একটা বাক্স পর্যন্ত নাই।"

কাউলা বলল, "খালি একটা টেলিভিশন।"

এতক্ষণ আমি কোনো কথাবার্তা বলি নাই, তাদের কথাবার্তায় আমার যোগ দেয়াটা মনে হয় ঠিক ভদ্রতাও হতো না, কিন্তু টেলিভিশনের ব্যাপারটা চলে আসায় আমি গলা খাকারী দিয়ে বললাম, "ইয়ে– মানে টেলিভিশনটা নষ্ট।"

ওস্তাদ বলল, "নষ্ট? কেমন করে নষ্ট হলো?"

"লাথি দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম। বাজে প্রোগ্রাম হচ্ছিল তো–"

ওস্তাদ এবং কাউলা মনে হয় প্রথমবার আমার দিকে ভালো করে তাকাল এবং আমি স্পষ্ট দেখলাম ওস্তাদের মুখটায় কেমন যে ভয়ের ছাপ পড়ল। সে ঘুরে কাউলার দিকে তাকিয়ে বলল "কাউলা, চল যাই।"

"চলে যাব?"

"হ্যাঁ। আমি কাম কাজ শিখছি সুলেমান ওস্তাদের কাছে। সুলেমান ওস্তাদ কইছে কখনো হাবাগোবা মানুষের বাড়িতে চুরি ডাকাতি করতে যাবি না।"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

"কেন ওস্তাদ?"

"বিপদ হয়। অনেক বড় বিপদ হয়।"

কাউলাকেও এবারে খুব চিন্তিত দেখাল। আমি আমার বাসায়, আমার বিছানায় মশারীর ভেতরে জবুথবু হয়ে বসে আছি। আর দুইজন ডাকাত আমার দিকে দুশ্চিন্তা নিয়ে তাকিয়ে আছে– পুরো ব্যাপারটার [illegible] যেন অবিশ্বাসের [illegible] আছে। কাউলা কাছে এসে মশারীটা তুলে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল– আমি মুখটাকে একটু হাসি হাসি করার চেষ্টা করলাম কিন্তু খুব একটা লাভ হলো না।

কাউলা ওস্তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওস্তাদ হাবাগোবা মানুষের বাড়িতে চুরি ডাকাতি করলে বিপদ হয় কেন?"

"একজন মানুষ কখন কী করবে সেটা আন্দাজ করা যায়, তার জন্যে রেডি থাকা যায়। কিন্তু বোকা মানুষ কখন কী করবে সেটা আন্দাজ করা যায় না। এরা একেবারে উল্টাপাল্টা কাজ করে সিস্টিম নষ্ট করে দেয়।"

কাউলা চিন্তিত ভাবে বলল, "ওস্তাদ, বিপদ ডেকে লাভ আছে? গুলি কইরা ফিনিস কইরা দেই।"

ওস্তাদ প্রস্তাবটা খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "নাহ্। গুলির অনেক দাম। বাজে খরচ করে লাভ নাই।"

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম, আমার জানের দাম গুলি থেকে কম হওয়ায় মনে হয় এই যাত্রা বেঁচে গেলাম।

কাউলা বলল, "এসেই যখন গেছি, যা পাই নিয়ে নেই?"

ওস্তাদ টেবিলের কাছে রাখা চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে উদাস গলায় বলল, "নে।"

কাউলা তখন আমার কাছে এগিয়ে আসে, হাতের বন্দুকটা দিয়ে মশারীটা উপরে তুলে বলল, "টাকা পয়সা যা আছে দেন।"

আমি তাড়াতাড়ি বালিশের নীচে থেকে মানি ব্যাগটা বের করে সেখান থেকে সব টাকা বের করে কাউলার হাতেই দিয়ে দিলাম। কাউলা গুনে মুখ বিকৃত করে বলল, "মাত্র সাতাইশ টাকা? তার মাঝে একটা দশ টাকার নোট ছিঁড়া?"

সাতাশ টাকার মাঝে একটা নোট ছেঁড়া বের হওয়ার জন্যে লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেলো। আমি কাচুমাচু হয়ে বললাম, "খেয়াল করি নাই, এক রিক্সাওয়ালা গছিয়ে দিয়েছে।"

"মাত্র সাতাইশ টাকা দিয়ে কি হইব? গ্রীল কাটার ভাড়া করছি দুইশ' টাকা দিয়ে।"

ওস্তাদ বলল, "বাদ দে কাউলা। বাদ দে।"

"বাদ দেই কেমন কইরা?" কাউলা মহাখাপ্পা হয়ে বলল, "বউয়ের সোনা গয়না অলংকার কই?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "জি, এখনও বিয়ে করি নাই।"

ওস্তাদ চেয়ারে বসে পা নাচাচ্ছিল। পা নাচানো বন্ধ করে বলল, "এখনও বিয়া করেন নাই?"

"জি না।"

"বয়স কতো?"

"সার্টিফিকেটে পঁয়ত্রিশ। অরিজিনাল আরো দুই বছর বেশি।"

"পঁয়ত্রিশ বছর বয়স এখনও বিয়া করেন নাই? তাহলে বিয়ে করবেন কখন? বুড়া হইলে?"

পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেলো এখনও বিয়ে হয়নি– সে জন্যে আবার আমার লজ্জায় মাথা কাটা গেলো। আমতা আমতা করে বললাম, "ইয়ে– চেষ্টা করে যাচ্ছি– কিন্তু কোনো মেয়ে রাজি হতে চায় না।"

কাউলা অবশ্যি বিয়ের আলাপে একেবারে উৎসাহ দেখাল না। আমার দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, "মূল্যবান আর কী আছে বাসায়?"

"জাহানারা ইমামের নিজের হাতে অটোগ্রাফ দেয়া একটা বই আছে।"

কাউলা কিছু না বুঝে ওস্তাদের দিকে তাকাল, ওস্তাদ হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গ করে বলল, "কাউলা, আয় যাই। হাবাগোবা মানুষের কাছাকাছি থাকা খুব বড় রিস্ক।"

কাউলা অবশ্যি তবু হাল ছাড়ল না, আমার দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, "সত্যিকারের মূল্যবান কী আছে? ঘড়ি? আংটি?"

"আংটি নাই।" আমি ঢোক গিলে বললাম, "একটা ঘড়ি আছে।"

"দেখি।"

আমি বালিশের তলা থেকে আমার ঘড়িটা বের করে দিলাম। ডিজিটাল ঘড়ি স্টেডিয়ামের সামনে ফুটপাত থেকে দশ টাকায় কিনেছিলাম। আরো ভালো করে দরদাম করলে মনে হয় আরো দুই টাকা কম রাখতো। ঘড়িটা দেখে কাউলা খুব রেগে গেলো, চিৎকার করে বলল, "আপনি একজন ভদ্রলোক মানুষ এই ঘড়ি পরেন? রিকশাওয়ালারাও তো এইটা পরে না।"

আমি বললাম, "জি খুব ভালো টাইম দেয়। প্রতি ঘন্টায় শব্দ করে।"

"শব্দের খেতা পুড়ি"– বলে কাউলা ঘড়িটা মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে গুড়ো করে ফেলল।

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

ওস্তাদ পা নাচানো বন্ধ করে মেঘের মতো গর্জন করে বলল, "কাউলা?"

"জে ওস্তাদ।"

"তুই এইটা কি করলি? তোরে কতবার বলেছি অপারেশন করার সময় রাগ করতে পারবি না। মাথা ঠাণ্ডা রাখবি। রাগ করলেই কাম কাজে ভুল হয়, বিপদ হয়। বলি নাই তোরে?"

"জে, বলেছেন ওস্তাদ।"

"এই মানুষ চরম হাবাগোবা– এর সামনে খুব সাবধান।"

"গত পরশু যে চাকু মারলাম একজনরে–"

"চাকু মারা ঠিক আছে। ভাবনা-চিন্তা করে ঠাণ্ডা মাথায় বাড়ির মালিকরে চাকু মারতেই বউ স্টীলের আলমারির চাবি দিয়ে দিল। এখানে তুই রাগ করে ঘড়িটা গুঁড়া করে দিলি তাতে কি লাভ হলো?"

কাউলা আমাকে দেখিয়ে বলল, "এরে একটা চাকু মারা ঠিক আছে?"

ওস্তাদ উদাস গলায় বলল, "মারতে চাইলে মার। চাকু মারায় খরচ নাই, গুলি নষ্ট হয় না। পত্রিকায় খবর উঠে মানুষ ভয়-ভীতি পায়, বিজনেসের জন্যে ভালো। চাকু আছে সাথে?"

কাউলা মাথা নাড়ল, বলল, "জে না। বড় অপারেশন মনে করে কাটা রাইফেল নিয়ে বের হইছিলাম।"

"তাহলে?"

কাউলা কিছুক্ষণ মাথা চুলকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার কাছে আছে?"

"জি একটা আছে। বেশি বড় না। একটু ভোঁতা।"

"ভোঁতা?" কাউলা খুব বিরক্ত হলো, "ভোঁতা চাকু কেউ ঘরে রাখে নাকি?"

বাসায় একটা ভোঁতা চাকু রাখার জন্যে আবার লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেলো। কাউলা মুখ খিচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "চাকুটা কই?"

"রান্নাঘরে। ড্রয়ারের ভিতরে।"

কাউলা খুব বিরক্ত হয়ে রান্নাঘরে চাকু আনতে গেলো। আমি আর ওস্তাদ চুপচাপ বসে আছি। আমি মশারীর ভিতরে, ওস্তাদ চেয়ারের ওপর। কোনো

কথা না বলে দুইজন চুপচাপ বসে থাকা এক ধরনের অভদ্রতা– আমি তাই আলাপ চালানোর জন্যে বললাম, "ইয়ে– চাকু মারলে কী ব্যথা লাগে?"

ওস্তাদ বলল, "কোথায় মারে তার উপর নির্ভর করে। পেটে মারলে [illegible]"

"আপনারা কোথায় মারবেন?"

"সেইটা কাউলা জানে– তার কোথায় মারার সখ। হাত পাকে নাই এখনো, প্র্যাকটিস দরকার।" ওস্তাদ আমাকে ভালো করে পরীক্ষা করে বলল, "আপনাকে মনে হয় পেটেই মারবে। ভুড়িটা দেখে লোভ হয়।"

"ও।" এরপর কী নিয়ে কথা বলা যায় চিন্তা করে পেলাম না। অবশ্যি আর দরকারও ছিল না। কাউলা ততক্ষণে চাকু আর একটা বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে চলে এসেছে।

ওস্তাদ বিরক্ত হয়ে বলল, "তোকে কতোবার কইছি জিব্বাটারে সামলা? অপারেশনে গিয়ে কখনো খাইতে হয় না, কই নাই?"

"কইছেন ওস্তাদ।"

"তাইলে?"

"আপনার জন্যে আনছি। কিরিম বিস্কুট।"

ওস্তাদের মুখটা একটু নরম হলো, বলল, "ও, কিরিম বিস্কুট? দে তাইলে।" ওস্তাদ আর কাউলা তখন টেবিলের দুই পাশে দুইটা চেয়ারে নিয়ে বসে ক্রিম বিস্কুট খেতে লাগল। মাত্র গতকাল কিনে এনেছি, যেভাবে খাচ্ছে মনে হয় এক্ষণি পুরো প্যাকেট শেষ করে ফেলবে।

মশারীর ভেতরে বসে বসে আমি কাউলা আর তার ওস্তাদকে দেখতে লাগলাম, বিস্কুট খাওয়া শেষ করেই তারা আমার পেটে চাকু মারবে। কী সর্বনাশ ব্যাপার! আমি এখন কী করব? মশারীসহ তাদের উপর লাফিয়ে পড়ব? চিৎকার করে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করব? হাত জোড় করে কাকুতি মিনতি করব? নাকি সিনেমায় যেরকম দেখেছি নায়কেরা মারামারি করে সেভাবে মারামারি শুরু করে দেব?

কিন্তু আমার কিছুই করা লাগল না, তখন সম্পূর্ণ অন্য একটা ব্যাপার ঘটল এবং সেটা ঘটাল একটা মশা। মশাটা সম্ভবত ওস্তাদের ঘাড়ে বসে কামড় দিয়ে খানিকটা রক্ত খাবার চেষ্টা করল, ওস্তাদ বিরক্ত হয়ে হাত দিয়ে মশাটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বলল, "ওহ! এই মশার যন্ত্রণায় মনে হয় ছুরি ডাকাতি ছেড়ে দিতে হবে।"

"ওস্তাদ, মশারে তাচ্ছিল্য কইরেন না।" কাউলা বলল, "ডেংগু মশা বিড়িয়ার থেকেও ডেঞ্জারাস।"

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

"ঠিকই কইছিস।" ওস্তাদ এবারে মশাটাকে লক্ষ্য করে তার নাকের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, দুই হাত দিয়ে [illegible] ফেলল– হাত তালি দেবার মতো একটা শব্দ হলো তখন।

সাথে সাথে খাটের নীচে রাখা মালিশ মেশিনের দুইটা হাত চালু হয়ে যায়। সেটাকে প্রোগ্রাম করা আছে যেদিকে শব্দ হয়েছে সেদিকে এগিয়ে যাবার জন্যে। কাজেই খাটের নীচে হাত দুটো আঙুলে ভর করে এগিয়ে আসতে শুরু করল। আমি বিস্ফারিত চোখে দেখলাম সেগুলো মেঝে খামচে খামচে এগিয়ে যাচ্ছে।

ওস্তাদের কাছাকাছি গিয়ে চেয়ারের পা বেয়ে হাত দুটো উপরে উঠতে শুরু করেছে।

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম এবং দেখলাম মাথার কাছাকাছি গিয়ে হাত দুটো নিঃশব্দে হঠাৎ করে ওস্তাদের ঘাড় চেপে ধরল। ওস্তাদ চমকে গিয়ে চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল। খপ করে পিস্তলটা হাতে নিয়ে পিছনে তাকাল, পিছনে কেউ নেই। সে হতবাক হয়ে ঘুরে সামনে তাকাল, সামনেও কেউ নেই। কাউলা ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছে– ভয়ে তার চোয়াল ঝুলে পড়েছে, মুখ হা হয়ে গেছে, গলায় কোথায় জানি একটা তাবিজ আছে সেই তাবিজটা ধরে কাঁপা গলায় বলল, "কসম লাগে– জিন্দাপীরের কসম লাগে– আল্লাহর কসম লাগে।"

ওস্তাদ হাত দিয়ে ঘাড়ে ধরে রাখা হাত দুটো ছোটানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সেগুলো লোহার মতো শক্ত, কারো সাধ্যি নেই ছোটায়। দুই হাতে ধরে টানাটানি করে ভয়ে চিৎকার করে বলল, "কাউলা– হাত লাগা– বাঁচা আমারে–"

"না ওস্তাদ। আমি পারুম না। এইটা নিশ্চয়ই ঘাউড়া ছগিরের কাটা হাত। আল্লাহর গজব লাগছে, কাটা হাত চইলা আইছে–"

ওস্তাদ অনেক কষ্ট করে একটা হাত ছুটিয়ে আনলো কিন্তু তাতে ফল হলো আরেক ভয়ানক। হাতটা ছুটে গিয়ে এবারে সামনে দিয়ে গলায় চেপে ধরল এবং আ-আ করে সারা ঘরে ছুটে ওস্তাদ টেবিলে ধাক্কা লেগে ধড়াম করে পড়ে গেলো। নীচে পড়ে গিয়ে সে দুই হাত দুই পা ছুঁড়তে থাকে– বিকট গলায় চিৎকার করতে থাকে, "কাউলারে কাউলা, বাঁচা আমারে– আল্লাহর কসম লাগে–"

কাউলা এবারে তার কাটা রাইফেল তাক করে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো। চিৎকার করে বলল, "খামোস, খামোস বলছি– গুলি কইরা দিমু, বেরাশ মারমু–"

[illegible] চিৎকার করে বলল, "কাউলা হারামজাদা গুলি করে আমারে মারবি নাকি– খবরদার।"

কাউলা বুঝতে পারল গুলি করায় সমস্যা আছে– তখন কাটা রাইফেলটা লাঠির মতো ধরে হাতটাকে মারার চেষ্টা করল, ঠিকভাবে মারতে পারল না, রাইফেলের বাটটা লাগল ওস্তাদের মাথায়, ঠকাস করে একটা শব্দ হলো আর চোখের পলকে মাথার এক অংশ গোল আলুর মতো ফুলে উঠল।

ওস্তাদ গগন বিদারী একটা চিৎকার করে দুই পা ছুঁড়ে একটা লাথি দিয়ে কাউলাকে ঘরের অন্য মাথায় ফেলে দেয়। কাউলা আবার উঠে আসে, কাটা রাইফেলটা দিয়ে আবার আঘাত করার চেষ্টা করল, ওস্তাদ ক্রমাগত ছটফট করছিল বলে এবারেও আঘাতটা লাগল মুখে এবং শব্দ শুনে মনে হলো তার চোয়ালটা বুঝি ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গেছে। কাউলা অবশ্যি হাল ছাড়ে না, ওস্তাদের গলার মাঝে চেপে ধরে রাখা হাতটাকে আবার তার কাটা রাইফেল দিয়ে মারার চেষ্টা করল। এবারে সত্যি সত্যিই মারতে পারল কিন্তু তার ফল হলো ভয়ানক!

কাটা হাতটা এতক্ষণ মালিশ করার চেষ্টা করছিল– রাইফেলের বাটের আঘাত খেয়ে তার যন্ত্রপাতি গোলমাল হয়ে গেলো, সেটা বিড়িং বিড়িং করে লাফাতে থাকে এবং যেটাকেই হাতের কাছে পেলো সেটাকেই ধরার চেষ্টা করতে লাগল। কাউলা ব্যাপারটা বুঝতে পারে নাই– হঠাৎ করে হাতটা তার উরুর মাঝে খামচে ধরে, কাউলা যন্ত্রণায় চিৎকার করে ঘরময় লাফাতে থাকে– আমার খাটের সাথে পা বেঁধে সে আছাড় খেয়ে পড়ল, বেকায়দায় পড়ে তার নাকটা থেতলে গেলো এবং আমি দেখলাম নাক দিয়ে ঝর ঝর করে আধ লিটার রক্ত বের হয়ে এলো।

দুইজন নীচে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে, আমি সাবধানে বিছানা থেকে নেমে প্রথমেই অস্ত্রগুলো আলাদা করলাম, ওস্তাদের পিস্তল, কাউলার কাটা রাইফেল আর আমার রান্নাঘরের চাকু। তখন শুনতে পেলাম কে যেন আমার ঘরের দরজা ধাক্কা দিচ্ছে, এখানকার ভয়ংকর নর্তন কুর্দন শুনে এই বিল্ডিংয়ের সবাই নিশ্চয়ই চলে এসেছে। দরজা খুলতে যাবার আগে আমার

মালিশ মেশিনের হাতগুলো সামলানো দরকার। আমি তিনবার হাত তালি দিলাম, দুইবার সাথে সাথে, তৃতীয়বার একটু পরে, ঠিক যেরকম সায়রা শিখিয়ে দিয়েছিল। সাথে সাথে হাতগুলো নেতিয়ে পড়ে যায়। আমি সাবধানে হাতগুলো নিয়ে খাটের নীচে রেখে দরজা খুলতে ছুটে গেলাম। আর একটু দেরী হলে মনে হয় দরজা ভেঙে সবাই ঢুকে যাবে। তখন বাড়িওয়ালাকে ব্যাপারটা বোঝানো খুব কঠিন হয়ে যাবে।

কাউলা এবং ওস্তাদের যে অবস্থা– তারা আর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে বলে মনে হয় না।

http://www.adultpdf.com
Created by Image To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

পুলিশ যখন কোমরে দড়ি বেঁধে কাউলা আর ওস্তাদকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন শুনলাম ওস্তাদ ফ্যাসফ্যাসে গলায় কাউলাকে বলছে, "তোরে কইছিলাম না– হাবাগোবা মানুষের বাসায় চুরি ডাকাতি করতে হয় না? অহন আমার কথা বিশ্বাস করলি?"

কাউলা ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "জে ওস্তাদ, করেছি। এই জন্যে আর হাবাগোবা মানুষের বাড়িতে ঢুকুম না। খোদার কসম।"

For More Books Of Humayun Ahamed &
Md. Jafar Iqbal,Please contact with us:
Shaibal & Jiku
shaibalrony@yahoo.com
01711982559